স্বাস্থ্যনীতি

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

তরুণ সাহিত্য মন্দির
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

বিনয়কৃষ্ণ সেন
অনূদিত

সুকুমারী সেন
প্রকাশিত

আষাঢ় ১৩৩৮

প্রকাশ প্রেস
৬৬, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত

মূল্য আট আনা

নিবেদন

'মহাত্মা গান্ধী লিখিত গুজরাতী 'আরোগ্যবিষে সামান্য জ্ঞান' নামক গ্রন্থের অনুবাদ স্বাস্থ্যনীতি নামে প্রকাশিত হইল। অনুবাদ কালে প্রয়োজন মত হিন্দী ও ইংরেজী সংস্করণেরও সাহায্য লইয়াছি। পাঠকগণের সুবিধার জন্য অধ্যায়-বিভাগ কালে কিছু নূতনত্ব অবলম্বন করা হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধীর এই প্রবন্ধগুলি দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার পরিচালিত ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৬৯ সংবতে বা ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সেগুলি পুস্তকাকারে বাহির হয়।

কলিকাতা

বিনয়কৃষ্ণ সেন

সূচী

প্রস্তাবনা

প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া আমি স্বাস্থ্যসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিতেছি। ইংলণ্ডে থাকার সময় স্বহস্তেই আহারাদির বন্দোবস্ত করিতাম; এ জন্য আমার অভিজ্ঞতার উপর সকলেই আস্থা স্থাপন করিতে পারেন। অভিজ্ঞতার ফলে আমি কতকগুলি স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছি। পাঠকদের মঙ্গল হইবে ভাবিয়া সে গুলি এখন প্রকাশ করিব।

ইংরেজীতে একটি কথা আছে, 'চিকিৎসা দ্বারা রোগ দূর করা অপেক্ষা, রোগ আদৌ না হইতে দেওয়া ভাল।' 'বর্ষার পূর্ব্বেই বাঁধ বাঁধা দরকার'—এ কথারও একই তাৎপর্য্য। যে শাস্ত্রে রোগ হইতে মুক্ত থাকার উপায় নির্দ্দেশ করা থাকে, ইংরেজীতে তাহাকে হাইজিন (Hygiene) বলে। আমরা ইহাকে 'স্বাস্থ্যনীতি' বলিতে পারি। কেহ কেহ বলেন, স্বাস্থ্যনীতি চিকিৎসা-শাস্ত্র হইতে ভিন্ন; কেহ বা ইহাকে চিকিৎসা-শাস্ত্রের অন্তর্গত মনে করেন। আমি এ দুয়ের প্রভেদ দেখাইতেছি, কারণ এ পুস্তকে প্রধানত স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় বলা হইবে। যেমন হারাণ মাণিক পাওয়া মুস্কিল এবং তাহা রক্ষা করার চেয়ে হারাণর পরে তলাস করিয়া বাহির করা বেশী কষ্টকর, সেইরূপ স্বাস্থ্য-রত্ন একবার নষ্ট হইলে তাহা পুনরুদ্ধার করা বহু কষ্ট ও সময়সাপেক্ষ। অতএব প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি যেন স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি বেশী

মনোযোগী হন। সচরাচর যে সব অসুখ আমাদের হইয়া থাকে, তাহা দূর করার উপায় সম্বন্ধেও এখানে আলোচনা করিব।

ইংরেজ কবি মিল্টন বলিয়াছেন—মানুষের মনই স্বর্গ, মনই নরক। মেঘের পরপারে কোথাও স্বর্গ এবং পৃথিবীর নীচে কোথাও নরক নাই। সংস্কৃতে আছে—"মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।" "মনই বন্ধন বা নরক এবং মোক্ষ বা স্বর্গের কারণ।" এ অনুসারে বলা চলে যে, সুস্থতা বা অসুস্থতা প্রত্যেকের নিজের উপর নির্ভর করে। শুধু কাজের ফলে যে আমরা অসুস্থ হই তাহা নহে, চিন্তার ফলেও আমরা অসুস্থ হইয়া থাকি। ইহার বহুত উদাহরণ আছে। ছেলের কলেরা দেখিয়া অনেক সময়ে বাপেরও কলেরা হইয়া থাকে। কোনো প্রসিদ্ধ চিকিৎসক বলিয়াছেন, যত লোক বসন্ত, প্লেগ ইত্যাদিতে মরে, তাহা অপেক্ষা বেশী মরে ঐ সব ব্যাধির ভয়ে।

রোগের প্রধান কারণ অজ্ঞতা। অজ্ঞতার জন্য আমরা অনেক স্থলে সাধারণ অসুখ বিসুখের সময়ও দিশাহারা হইয়া পড়ি এবং ভাল করিতে গিয়া মন্দ করিয়া বসি। স্বাস্থ্যের নিয়ম না জানার জন্য আমরা অনেক সময় অন্যায় কাজ করি এবং ধূর্ত্ত হাতুড়ে চিকিৎসকের কবলে গিয়া পড়ি। দূরের জিনিষ অপেক্ষা নিকটের জিনিষের জ্ঞান আমাদের কম—ইহা আশ্চর্য্য ব্যাপার হইলেও অতি সত্য কথা। নিজের পাড়ার খবর রাখি না, কিন্তু ইংলণ্ডের নদ নদী পাহাড় পর্ব্বতের নাম চটপট বলিতে পারি। আকাশের নক্ষত্র সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার জন্য আমরা কত পরিশ্রম করি, অথচ নিজের ঘরের খবর রাখি না। আকাশের তারা গুণিবার সাধ আমাদের হয়, কিন্তু নিজের ঘরে কটি কড়ি-বরগা অথবা রুয়ো আছে তা জানি না। চোখের সামনে অনুষ্ঠিত প্রকৃতির বিচিত্র নাটক অভিনয় দেখার ইচ্ছা আমাদের নাই, কিন্তু নকল

নাট্যশালার আড়ম্বর দেখার জন্য আমরা বড় ব্যস্ত। আর ঠিক এইরূপে, আমাদের শরীরের ভিতর কি হইতেছে, শরীর কি, কোন্ উপাদানে ইহা গঠিত, শরীরের ভিতরের হাড়, মাংস রক্ত প্রভৃতি কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহারা কি কাজে লাগে, শরীরের ভিতর কথা বলার মূল কি, আমরা চলি কেন, আমাদের মনে কখনও খারাপ ও কখনও বা ভাল চিন্তা আসে কেন, আমাদের শরীর প্রায় নিশ্চল অবস্থায় থাকা সত্ত্বে মন কিরূপে লক্ষ লক্ষ মাইল ভ্রমণ করে, মন হাওয়া অপেক্ষা হাজার গুণ দ্রুত চলে কেন, এ সব প্রশ্নের উত্তর আমরা মোটেই জানি না। শরীরের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তথাপি এ বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা এবং ঔদাসীন্যের সীমা নাই।

এই অসহায় অবস্থা হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য সকলের চেষ্টা করা উচিত। শরীর ও মনের সম্বন্ধ জানা খুব কঠিন। কিন্তু শরীর সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান প্রত্যেক লোকের থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে শিক্ষাদান স্কুলে বাধ্যতামূলক করা উচিত। আঙুল কাটিয়া গেলে কি করিতে হইবে তা আমরা জানি না, কাঁটা বিঁধিলে তাহা বাহির করিতে পারি না, সাপে কাটিলে আমরা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ি। এইরূপ আরও অনেক বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা এত বেশী যে, সে সম্বন্ধে একবার চিন্তা করিলে লজ্জায় আমাদের মাথা নীচু হয়। সাধারণ লোকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছুই বুঝিবে না, এরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত। যাহারা এ বিষয়ে কিছু শিখিতে ইচ্ছুক তাহাদের জন্যই এই পুস্তক লেখা হইল।

যে সব কথা বলিব, তাহা পূর্ব্বে কেহ বলেন নাই, ইহা আমি কহিতেছি না। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন পুস্তকের সারাংশ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিব। এই সব বই পড়িয়া এবং খুব সাবধানে পঃ

করিয়া আমি আমার সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছি। অধিকন্তু যাহারা নূতন শিক্ষার্থী তাহারা এ পুস্তক পড়িলে সহজেই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন; কারণ এরূপ বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থকারের পরস্পর-বিরোধী মত দেখিলে তাহাদের ধাঁধায় পড়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, একজন লেখক কোনো বিশেষ অবস্থায় গরম জল ব্যবহার করিতে বলেন। অপর এক গ্রন্থকার ঠিক ঐ অবস্থায় ঠাণ্ডা জলের ব্যবস্থা করেন। নূতন লোকের পক্ষে এ বড় বিষম সমস্যা। এরূপ পরস্পর-বিরোধী মতসকল আমি সাবধানে আলোচনা করিয়াছি। এ জন্য পাঠকগণ আমার মতের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারেন।

সামান্য অসুখ হইলেই আমরা ডাক্তার, কবিরাজ অথবা হেকিমের কাছে ছুটি। চিকিৎসকের অভাবে নাপিত অথবা পাড়াপড়শীর পরামর্শে ঔষধ খাই। আমরা ধরিয়া লই যে, ঔষধ বিনা রোগ দূর হয় না। ইহা মস্ত ভুল। এই ভুল লোকের যত কষ্টের মূল এত আর কিছুই নহে। অবশ্য ব্যারাম হইলে তাহা দূর করা দরকার, কিন্তু ঔষধ যে শুধু অকেজো তাহা নহে, বরং ইহা ব্যবহারে অনেক সময় বিশেষ ক্ষতি হয়। বাড়ীর ভিতর আবর্জ্জনা জমিলে তাহা ঢাকিয়া রাখার চেষ্টা করা যেরূপ মূর্খতা, রোগ হইলে ঔষধ খাইয়া তাহা দূর করার চেষ্টা করাও ঠিক সেইরূপ মূর্খতা। যতই আমরা আবর্জ্জনা বেশী ঢাকিয়া রাখিব, উহা পচিয়া আমাদের ততই অনিষ্ট করিবে। শেষে ঢাকনী পর্য্যন্ত পচিয়া ময়লা বাড়িবে এবং তাহা পরিষ্কার করার খাটুনিও বাড়িবে। আবর্জ্জনা না ঢাকিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলে বাড়ী আবার পূর্ব্বের মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। যাহারা ঔষধপত্র খায় তাহাদের অবস্থাও ঠিক এইরূপ। প্রকৃতি নিজেই শরীরের আবর্জ্জনা বাহির করার রাস্তা বানাইয়া

রাখিয়াছে। রোগ হইলে বুঝিতে হইবে, প্রকৃতি শরীরের ভিতরে সঞ্চিত আবর্জ্জনা বাহির করা সুরু করিয়া দিয়াছে। আমাদের বাড়ীর আবর্জ্জনা যে সাফ করিতে আসে, তাহাকে আমরা উপকারী মনে করি, আর আবর্জ্জনা সাফ করার সময় একটু অসুবিধা ভোগ করিলেও তাহা বরদাস্ত করিয়া থাকি। এরূপে প্রকৃতি যখন আমাদের শরীর-রূপ ঘর হইতে ময়লা সাফ করে, তখন যদি আমরা অস্থির না হইয়া শান্ত থাকি তবে আমাদের শরীর সাফ হইয়া যায় ও আমরা নীরোগ হইতে পারি। ধরা যাউক, কাহারও সর্দ্দি হইয়াছে; এজন্য ছুটাছুটি করিয়া শুঁঠ বা আদা খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হওয়ার দরকার নাই। কারণ আমরা জানি, প্রকৃতি আমাদের শরীরে সঞ্চিত আবর্জ্জনা বাহির করিয়া দিতেছে, ইহার ফলে শরীর ময়লাশূন্য হইবে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে প্রকৃতির কাজ বাড়িয়া যাইবে; আবর্জ্জনা সাফ করা ভিন্ন আমাদের সহিত তাহাকে লড়াই করিতে হইবে। ইচ্ছা করিলে আমরা প্রকৃতির কাজে সাহায্য করিতে পারি, আবর্জ্জনা সঞ্চিত হওয়ার কারণ দূর করিতে পারি, যাহাতে শরীরের আবর্জ্জনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয় তাহা করিতে পারি। এই সময় উপবাস করিলে শরীরে নূতন আবর্জ্জনা সঞ্চিত হয় না, খোলা যায়গায় ব্যায়াম করিলে চামড়ার ছিদ্রপথে ঘাম দ্বারা শরীরের আবর্জ্জনার কতকটা বাহিরে যায়। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সকলেই এই সুবর্ণ নিয়ম পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। কিন্তু মনকে স্থির রাখা চাই। যাঁহার সাচ্চা ঈশ্বর-ভক্তি আছে তিনি তো ইহা করিবেন। ঔষধ ব্যবহার করিলে রোগ দূর হইবে, ইহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। যাহারা ঔষধ-পত্র সেবন করে, তাহাদের অনেকেই ব্যাধিগ্রস্তই থাকে—এই চিন্তাই মনকে স্থির রাখার সাহায্য করিবে। ঔষধ খাইলেই যদি রোগ দূর হইত, তবে এই পুস্তক লেখার দরকার হইত না।

নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, কোনো বাড়ীতে ঔষধের বোতল প্রবেশ করিলে, সেখান হইতে তাহাকে বাহির করা যায় না ; বরং বোতলের সংখ্যা ক্রমে বাড়িতে থাকে। ঔষধের পর ঔষধ সেবন করিয়াও অনেক লোক সারাজীবন কোনো না কোনো রোগে ভুগিতেছে দেখা যায়। তাহারা আজ এক কবিরাজের, কাল আর এক ডাক্তারের ঔষধ ব্যবহার করে। তাহাদের সম্পূর্ণরূপে নীরোগ করিয়া দিবে এরূপ চিকিৎসকের নিষ্ফল সন্ধানে তাহারা সারাজীবন ঘুরিয়া বেড়ায়, পরে নিজেরা হয়রাণ হইয়া ও অপরকে হয়রাণ করিয়া অশেষ যন্ত্রনাভোগের পর মারা যায়। প্রসিদ্ধ জজ পরলোকগত ষ্টিফেন সাহেব (ইনি কিছুদিন ভারতেও ছিলেন) বলেন—যে সব গাছগাছড়া সম্বন্ধে চিকিৎসকগণ অতি অল্পই জানেন, তাঁহারা সেই গাছগাছড়া মনুষ্যশরীরের উপর প্রয়োগ করেন—এই মনুষ্য শরীরের জ্ঞান তাঁহাদের আরও কম। পূর্ণ অভিজ্ঞতার পর অনেক চিকিৎসক তাঁহার এই কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে কয়েকজন প্রসিদ্ধ ডাক্তারের অভিমত দিতেছি :—

ডাক্তার মেজেন্দী বলেন—"চিকিৎসাবিদ্যা মহা প্রবঞ্চনার উপরে প্রতিষ্ঠিত।" স্যার এষ্টলি কুপার বলেন—"চিকিৎসা-শাস্ত্র অনেকখানি আন্দাজের উপর রচিত।" স্যার জন ফরবেস্ স্বীকার করিয়াছেন—"ঔষধ অপেক্ষা প্রকৃতিই অধিকাংশ রোগ দূর করে।" ডাক্তার বেকার ও ডাক্তার ফ্রাঙ্ক বলেন, "রোগের অপেক্ষা ঔষধেই বেশী লোক মরে।" ডাক্তার ফ্রাথ বলিয়াছেন—"ডাক্তারদের মত এত ফাঁকি দিয়া দুনিয়ায় কেহ পয়সা রোজগার করে না।" ডাক্তার টমাস ওয়াটসন বলেন—"স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় প্রশ্নের সদুত্তর ডাক্তারীমতে দেওয়া যায় না।" ডাক্তার ফাজবেল বলেন—"চিকিৎসকগণ দুনিয়া হইতে লোপ পাইলে মানব-

জাতির অশেষ কল্যাণ হইত।" ডাক্তার ম্যাসন গুড বলেন—"যুদ্ধ, মহামারী এবং দুর্ভিক্ষে যত লোক মরে, তাহা অপেক্ষা বেশী লোক মরে ঔষধ ব্যবহারের ফলে।"

দেখা যায় যেখানে ডাক্তারের সংখ্যা বাড়ে সেখানে রোগের সংখ্যাও বাড়ে। অন্য কোনো প্রকার বিজ্ঞাপন না থাকিলেও প্রত্যেক সংবাদপত্রে ঔষধের বড় বড় বিজ্ঞাপন থাকে। 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে' যখন বিজ্ঞাপন লওয়া হইত, তখন তাহার কর্ম্মকর্ত্তা বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্য বাহির হইলেই, ঔষধ বিক্রেতাগণ উহাতে তাহাদের বিজ্ঞাপন ছাপানর জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করিত এবং এজন্য অনেক টাকা দিতে চাহিত। যে ঔষধের খরচা এক পয়সা পড়ে, তাহা কিনিতে আমরা এক টাকা পর্য্যন্ত খরচ করি। অধিকাংশ ঔষধওয়ালা তাহাদের ঔষধ কি কি উপাদানে প্রস্তুত তাহা প্রকাশ করে না। 'পেটেণ্ট ঔষধ' নামে একখানি পুস্তক কোনো ঔষধ বিক্রেতা সংপ্রতি প্রকাশ করিয়াছেন। লোককে ভুলভ্রান্তি হইতে রক্ষা করাই তাহার উদ্দেশ্য। ঐ পুস্তকে লেখা আছে, আমরা যে সার্সাপেরিল্লা, ফ্রুট সল্ট, সিরাপ প্রভৃতি বিখ্যাত পেটেণ্ট ঔষধের জন্য সওয়া দুই টাকা হইতে পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত মূল্য দিয়া থাকি, তাহা তৈরী করার খরচা এক পয়সা হইতে এক আনা পর্য্যন্ত। এই হিসাবে আমরা ঔষধের আসল মূল্যের ছত্রিশ হইতে তিন শত ছত্রিশ গুণ মূল্য দিয়া উহা কিনি; অর্থাৎ আমরা ঔষধবিক্রেতাদের শতকরা ৩৫০০৲ হইতে ৩৫০০০৲ মুনাফা দিয়া থাকি।

ইহা হইতে পাঠকগণ বুঝিবেন, রোগীর কোনো মতে ডাক্তারের চক্করে না পড়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় লোকের তর সয় না। সাধারণের মনে একথা জাগেই না যে, সকল ডাক্তারকেই অবিশ্বাস করা উচিত এবং ঔষধসেবনের ফল সব সময় খারাপ। এই সব লোকের

নীচের কথার প্রতি খেয়াল রাখা উচিত ঃ—যতটা সম্ভব সবুর কর ; ডাক্তার কবিরাজকে অনর্থক ডাকিয়া কষ্ট দিও না। ডাক্তার যদি ডাকিতেই হয়, তবে কোনো ভালমানুষ ডাক্তারকে ডাকিবে। তাঁহার পরামর্শ মত চল। তিনি না বলিলে আর কাহাকেও ডাকিবে না। কিন্তু মনে রাখিও রোগ সারার ক্ষমতা ডাক্তারের নাই। আর তদ্বির করার পরেও যদি তোমার অথবা তোমার আত্মীয়স্বজনের বাঁচার সম্ভাবনা না থাকে, তবে দুঃখ করিয়া লাভ কি ; জানিও ইহা জীবনের এক পরিবর্ত্তন।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

প্রথম খণ্ড

নকল গোলাপকে যেমন কেহ আদর করে না, সেইরূপ যে শরীর শুধু দেখিতে সুন্দর কিন্তু যাহার আত্মার সৌন্দর্য্য নাই, সে শরীরকে কেহ ভালবাসে না। খারাপ চরিত্রের লোককে নীরোগ বলা যায় না। শরীর ও আত্মার এরূপ নিকট সম্বন্ধ যে, যাঁহার শরীর নীরোগ তাঁহার মন অবশ্যই পবিত্র হইবে। পাশ্চাত্য দেশে এই মতানুবর্ত্তী একটি দল আছে। তাঁহারা বলেন, যাঁহার মন শুদ্ধ তাঁহার রোগই হয় না; আর হইলেও ঐ শুদ্ধ মনের প্রভাবে তিনি শরীরকে নীরোগ করিতে সক্ষম। মোট কথা এই যে, আমাদের মনই স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান সাধন। আর চিত্তশুদ্ধি দ্বারা স্বাস্থ্যলাভ করা যায়।

তামসিকতা, আলস্য, বধিরতা এ সবই ব্যারামের চিহ্ন। কত ডাক্তার তো চুরি প্রভৃতি খারাপ প্রবৃত্তিকে ব্যাধি মনে করেন। বিলাতে বড় ঘরের অনেক মহিলা দোকান হইতে বহু মামুলী জিনিষ চুরি করেন দেখা যায়। সেখানে, ডাক্তারগণ ইহাকে 'ক্লিপ্টোমেনিয়া বা 'চৌর্য্যব্যাধি' বলেন। কোনো কোনো লোকের মারামারি না করিলে ভাল ঠেকে না। ইহাও এক রকমের ব্যারাম।

যাহার দেহ সুগঠিত, কান চোখ ইত্যাদি ময়লাশূন্য, নাক দিয়া শ্লেষ্মা বহে না, যাহার চামড়া দিয়া বেশ ঘাম বহে এবং তাহা হইতে কোনো দুর্গন্ধ বাহির হয় না, যাহার মুখ দুর্গন্ধশূন্য, হাত পা যাহার নিয়মিতভাবে কর্ত্তব্য পালন করে, যে খুব মোটা অথবা খুব কৃশ নহে, যে বিষয়াসক্ত নহে এবং ইন্দ্রিয় মন সর্ব্বদা যাহার অধীন থাকে, সে নীরোগ। এইরূপ স্বাস্থ্যলাভ করা ও তাহা রক্ষা করা সহজ নহে। আমাদের মাতাপিতার এইরূপ স্বাস্থ্য না থাকিলে আমরাও এরূপ স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারি না। জনৈক লেখক লিখিয়াছেন, মা-বাপ সর্ব্ব প্রকারে যোগ্য হইলে তাহাদের সন্তান তাহাদের অপেক্ষা সব

রকমে শ্রেষ্ঠ হইবে। অভিব্যক্তি-বাদীগণ অর্থাৎ যাহারা বলেন জগৎ ক্রমশঃ উন্নতির দিকে যাইতেছে তাহারা তো ইহা নিশ্চয়ই মানিবেন। সম্পূর্ণ নীরোগ ব্যক্তির মৃত্যু-ভয় নাই। আমরা সুস্থ নহি বলিয়া মৃত্যুকে এত ভয় করি। মৃত্যু আমাদের পক্ষে এক পরিবর্ত্তন সদৃশ। সৃষ্টির নিয়মে এই পরিবর্ত্তনে মঙ্গল হইয়া থাকে। প্রকৃত স্বাস্থ্যলাভের জন্য চেষ্টা করা আমাদের সকলের সুস্পষ্ট কর্ত্তব্য। কিরূপে এরূপ স্বাস্থ্য লাভ করা যায় এবং কিরূপেই বা তাহা রক্ষা করিতে হয় তাহা ক্রমে আলোচনা করিব।

—দ্বিতীয় অধ্যায়—

আমাদের শরীর

ক্ষিতি, জল, পাবক, পবন পুনি পঞ্চম গগন বিচার।
পঞ্চ তত্ত্বকে পিণ্ডকো নাম ভয়ো সংসার॥

উপরের দোহা হইতেই শরীরের বর্ণনা ভালভাবে পাওয়া যায়। ক্ষিতি (মাটি), জল, আগুন, বাতাস ও আকাশ লইয়া প্রকৃতি ও প্রকৃতির সৃষ্টিকর্ত্তা যে লীলা করেন তাহাকেই আমরা জগৎ বলি। যে যে জিনিষ দ্বারা এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে সেই সেই জিনিষ দ্বারাই এই মাটির পুতুল—আমাদের শরীরও সৃষ্ট হইয়াছে। একটি কথা আছে—'যথা পিণ্ডে তথা ব্রহ্মাণ্ডে'—দেহের ভিতরও যাহা আছে জগতেও তাহাই আছে। এই ব্যাক্যটির তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিলে বুঝা যাইবে যে, শরীর রক্ষার জন্য পরিষ্কার মাটি, পরিষ্কার জল, পরিষ্কার সূর্য্যকিরণ, পরিষ্কার ময়দান (আকাশ) এবং পরিষ্কার হাওয়া অত্যন্ত দরকারী। ইহার কোনোটি হইতে ভয়ের কারণ নাই। শরীরে ইহার কোনোটির অভাব হইলে, ব্যাধি উৎপন্ন হয়।

রক্ত, মাংস, চামড়া ও হাড় দ্বারা শরীর গঠিত। হাড়ই শরীরের কাঠামোর ন্যায়। হাড় না থাকিলে আমরা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে অথবা চলাফেরা করিতে পারিতাম না। ইহা শরীরের কোমল অংশগুলি রক্ষা করে। মাথার খুলি মগজ রক্ষা করে এবং পাঁজরার হাড় হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস রক্ষা করে। ডাক্তারগণ বলেন, মানুষের শরীরে ২৩৮ খানা হাড় আছে। হাড়ের উপরিভাগ শক্ত কিন্তু ভিতরের অংশ ফাঁপা

ও নরম। অস্থির সংযোগস্থলে মজ্জার প্রলেপ আছে; এই মজ্জাকে নরম হাড় বলা যাইতে পারে।

আমাদের দাঁতগুলিকেও একপ্রকার হাড় বলা যায়। শিশুকালে যে দাঁত উঠে তাহাকে 'দুধে দাঁত' বলে। ঐ গুলি পড়িয়া গিয়া 'অন্ন দাঁত' উঠে। এ গুলি পড়িয়া গেলে কিন্তু আর দাঁত উঠে না। ৬ হইতে ৮ মাসে শিশুর 'দুধে দাঁত' উঠা সুরু হয় এবং দুই আড়াই বৎসরে উঠা শেষ হয়। 'অন্ন দাঁত' ৫ বৎসরের পর উঠে এবং ১৭ হইতে ২৫ বৎসরের ভিতর উঠা শেষ হয়। মাড়ির দাঁত সকলের শেষে উঠে।

কোনো স্থানের মাংস চাপিয়া ধরিলে বুঝা যায় উহা শক্ত ও স্থিতিস্থাপক। এইরূপ অংশকে মাংসপেশী বলে। আমাদের জ্ঞানতন্তু ইহাদের সাহায্যেই কাজ করে। মাংসপেশীর সাহায্যেই আমরা হাত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিতে পারি, চোয়াল নড়াইতে পারি, চোখ বুজিতে ও খুলিতে পারি।

এই পুস্তকে শরীর সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা করিতে চাই না। আর লেখকের সে বিষয়ে পুরোপুরি জ্ঞানও নাই। যতটুকু বিবরণ আমাদের একান্ত আবশ্যক, ততটুকু বিবরণ দেওয়া হইবে। পাকস্থলীই শরীরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ। মুহূর্ত্তমাত্রও যদি পাকস্থলীর ক্রিয়া বন্ধ হয়, তবে আমাদের সমস্ত শরীর শিথিল হইয়া যাইবে। পাকাশয়ের উপর আমরা যত ভার চাপাই, তাহা সহ্য করার শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী বন্য জন্তুরও নাই। পাকস্থলী ভুক্তদ্রব্য হজম করিয়া শরীরের পুষ্টিবিধান করে। রেলগাড়ীর সহিত ইঞ্জিনের যে সম্বন্ধ, শরীরের সহিত পাকস্থলীর সেই সম্বন্ধ। পাকস্থলী পাঁজরার বাম দিকে থাকে। পাকাশয়ের ভিতর হইতে হজমীরস নির্গত হইয়া খাদ্যের সারাংশকে রক্তের সহিত মিশাইবার সাহায্য করে; অবশিষ্ট অসার অংশ মলমূত্ররূপে

অন্ত্রের পথে বাহিরে আসে। ইহার উপরের দিকে কলিজার বাম অংশ। পাকাশয়ের বাম দিকে প্লীহা। পাঁজরার ভিতর ডাহিনে কলিজা বা হৃৎপিণ্ড। যকৃতের কাজ রক্ত পরিষ্কার করা ও পিত্ত উৎপাদন করা। হজমের পক্ষে এই পিত্ত বহু উপযোগী। পাঁজরার নীচে অন্তঃকরণ এবং ফুসফুস আছে। অন্তঃকরণের থলি, দুই ফুসফুসের মধ্যে বাম দিকে থাকে। বুকের ছাতিতে মোট ২৪ খানা হাড় আছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পাঁজরার ভিতরে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুভব করা যায়। আমাদের ফুসফুস শ্বাসনলির সহিত সংযুক্ত। আমরা যে নিশ্বাস গ্রহণ করি শ্বাসনলির পথে তাহা ফুসফুসে যায়; এবং ইহাতে রক্ত সাফ হয়। মুখ দিয়া নিশ্বাস না টানিয়া, নাক দিয়া নিশ্বাস টানা বিশেষ দরকার। নাক দিয়া যে হাওয়া ভিতরে যায় তাহা গরম হইয়া ফুসফুসে পৌঁছে। লোকে না জানিয়া মুখ দিয়া শ্বাস লইয়া শরীরের ক্ষতি করে। মনে রাখিতে হইবে আহারাদির জন্য মুখের সৃষ্টি হইয়াছে। সর্ব্বদা নাক দিয়াই শ্বাস লওয়া উচিত।

এখন দেহের আধাররূপ সঞ্চরণশীল রক্তের বিষয় আলোচনা করিব। রক্ত দ্বারা আমাদের শরীরের পুষ্টি হয়। রক্তই খাদ্যের ভিতর হইতে পুষ্টিকর অংশকে গ্রহণ করিয়া, অসার ভাগকে মলমূত্রের আকারে বাহির করিয়া দেয় এবং শরীরকে গরম রাখে। রক্ত সর্ব্বদা শরীরের ভিতরের শিরা উপশিরার মধ্য দিয়া যাতায়াত করে। রক্ত চলাচলের জন্য আমাদের নাড়ীর এক মিনিটে প্রায় ৭২ বার স্পন্দন হয়। শিশুদের নাড়ী আরও দ্রুত এবং বৃদ্ধদের নাড়ী আরও ধীরে চলে।

হাওয়াই রক্ত পরিষ্কার রাখার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সহায়। সমস্ত শরীর ঘুরিয়া আসিয়া রক্ত যখন ফুসফুসে যায়, তখন উহা দূষিত হয় এবং উহার ভিতর বিষাক্ত দ্রব্য থাকে। আমরা নিশ্বাস দ্বারা যে অম্লজান

বাষ্প গ্রহণ করি তাহা এই দূষিত রক্তকে শুদ্ধ করে এবং রক্তের সহিত মিশিয়া যায়; আবার অঙ্গারাম্ল অংশ রক্তের বিষাক্ত পদার্থ লইয়া প্রশ্বাস-রূপে বাহিরে আসে। প্রাণবায়ু রক্তের সহিত মিশিয়া সারা শরীরে ছড়াইয়া পড়ে। ইহা হইতে বুঝা যায়, যে প্রশ্বাস শরীরের ভিতর হইতে বাহিরে আসে, তাহা কত বিষাক্ত। এই প্রক্রিয়া অনবরত চলিতেছে। হাওয়া দেহের এত প্রয়োজনীয় কাজ করে বলিয়া একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে ইহার বিশদ আলোচনা করিব।

—তৃতীয় অধ্যায়—

হাওয়া

শরীর ধারণের জন্য হাওয়া জল ও খাদ্য এই তিনটি জিনিষই বিশেষ আবশ্যক। ইহার ভিতর হাওয়া সব চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। প্রকৃতি হাওয়া এত অধিক পরিমাণে সৃষ্টি করিয়াছে যে, আমরা ইহা বিনামূল্যে পাই। কিন্তু বর্ত্তমান সভ্যতা বিশুদ্ধ হাওয়াকেও ব্যয়সাপেক্ষ করিয়াছে, কারণ বিশুদ্ধ হাওয়ার জন্য লোককে শহরের বাহিরে যাইতে হয় এবং ইহাতে কিছু খরচও পড়ে। মাথেরনের হাওয়া সেবন করিয়া বোম্বাই-বাসীরা নিঃসংশয়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে পারে, মালাবার পাহাড়ের হাওয়ায় তাহাদের আরও উপকার হয়; কিন্তু সেখানে যাইতে তাহাদের অর্থব্যয় হয়। ভাল হাওয়া খাইতে হইলে 'দরবনের' অধিবাসীদের 'বেরিয়ায়' যাইতে হয়—ইহাতে পয়সা খরচ হয়। সুতরাং বিশুদ্ধ হাওয়া বিনামূল্যে পাওয়া যায়, আজ কাল ইহা বলা চলে না।

নির্ম্মল হাওয়া বিনামূল্যে পাওয়া যাক আর না যাক, ইহা ঠিক যে, ইহা ভিন্ন এক মুহূর্ত্তও আমাদের চলে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, রক্ত সমস্ত শরীরে ঘুরিয়া ফুসফুসে আসিয়া শুদ্ধ হয় এবং পুনরায় সমস্ত শরীরে সঞ্চালিত হয়। এই কাজ সব সময় চলে। আমরা দূষিত বায়ু পরিত্যাগ করি এবং বায়ুতে যে অম্লজান পদার্থ আছে বাহির হইতে তাহা গ্রহণ করি। এই অম্লজান পদার্থ শ্বাসের সহিত শরীরের ভিতর গিয়া রক্ত সাফ করে। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া হরদম চলিতেছে এবং ইহার উপর মানুষের জীবন নির্ভর করে। জলে ডুবিলে মানুষ মরে, কারণ তখন সে শরীরের দূষিত বায়ু বাহির করিতে পারে না এবং

বাহিরের নির্ম্মল বায়ু লইতে পারে না। ডুবরীরা পোষাক পরিয়া জলের ভিতর নামে এবং জলের উপর পর্য্যন্ত যে নল থাকে তাহার সাহায্যে বাহিরের হাওয়া গ্রহণ করে ; এজন্য তাহারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জলের ভিতর থাকিতে পারে।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, লোকে হাওয়া বিনা পাঁচ মিনিটের বেশী বাঁচিতে পারে না। কখনও কখনও মায়ের অসাবধানতার জন্য বুকের চাপে শিশুর দমবন্ধ হইয়া মৃত্যু হয়।

এই কথা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, হাওয়া আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় খাদ্য, আর না চাহিতেই আমরা ইহা পাই। জল ও অন্ন খুঁজিলে এবং চাহিলে পাওয়া যায়, কিন্তু ইচ্ছা না করিলেও আমরা হাওয়া পাই। ময়লা জল ও খারাপ খাদ্য খাইতে আমাদের যেরূপ অসুবিধা ও আপত্তি হয়, হাওয়া সম্বন্ধেও আমাদের সেইরূপ হওয়া উচিত। কিন্তু সাধারণত আমরা যে জল পান করি ও যে খাদ্য আমরা খাই, তাহা অপেক্ষা যে হাওয়া আমরা গ্রহণ করি তাহা অনেক দূষিত। আমরা সকলে সাকারবাদী ; যে সব জিনিষ আমরা দেখিতে বা স্পর্শ করিতে পারি না তাহা অপেক্ষা যেগুলি দেখিতে পাই বা স্পর্শ করিতে পারি সেগুলি আমরা অনেক বেশী প্রয়োজনীয় মনে করি। বাতাস চোখে দেখা যায় না বলিয়া, কত দূষিত হাওয়া যে আমরা গ্রহণ করি, সে ধারণা করিতে পারি না। অন্যের উচ্ছিষ্ট খাদ্য খাইতে আমরা আপত্তি করি। অন্যের মুখ দেওয়া জল পান করার সময়েও আমরা ইতস্ততঃ করিয়া থাকি। ঘৃণার উদ্রেক না হইলেও, অপরের বমি করা খাদ্য অথবা কুলকুচি করা জল আমরা নিশ্চয়ই কখনও খাইব না। দুর্ভিক্ষপীড়িত ক্ষুধার্ত্ত লোকে মরিবে তবুও উহা খাইতে রাজী হইবে না। কিন্তু আমরা অন্যের পরিত্যক্ত প্রশ্বাস কোনো সঙ্কোচ অথবা ঘৃণা বিনা

মল আলগা থাকিলে হাওয়ায় কত বদ গন্ধ হয়। খাদ্যের সহিত কেহ মল মিশাইয়া আমাদের সামনে রাখিলে উহা দেখিয়াই আমাদের বমির ভাব আসিবে; কিন্তু পায়খানার মল হইতে যে দুর্গন্ধযুক্ত হাওয়া আসে তাহা আমরা নির্ব্বিকারে গ্রহণ করি। বাস্তবিক উহাতে এবং মলমিশান খাদ্যে কোনো তফাৎ নাই। তফাৎ এইটুকু যে, মল মিশান খাদ্য আমরা চোখ দিয়া দেখিতে পারি, আর পায়খানার দুর্গন্ধযুক্ত হাওয়াকে চোখে দেখা যায় না।

পায়খানায় বসিবার যায়গা, নর্দ্দমা ইত্যাদি খুব সাফ রাখা দরকার। দুঃখের বিষয়, এরূপ কাজ করিতে আমাদের লজ্জা হয়, পায়খানা সাফ করিতে আমাদের ঘৃণা হয়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অপরিষ্কার পায়খানা ব্যবহার করিতেই আমাদের ঘৃণা হওয়া উচিত। যে মল আমাদের শরীরের ভিতর হইতে বাহির হয়, তাহা অপর লোক দ্বারা আমরা উঠাইয়া লই; এরূপ না করিয়া তাহা নিজেরা সাফ করায় দোষ কি? ইহা একটুও খারাপ কাজ নহে। ইহা আমরা নিজেরা শিখিয়া যেন ছেলেপিলেদের শিখাই। যখন বালতি মল দ্বারা ভরিয়া যাইবে, তখন তাহা উঠাইয়া লইয়া প্রায় দেড়হাত গভীর (২ ফুট) গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার ভিতর মল রাখিয়া তাহা মাটি দিয়া ভালভাবে চাপা দিবে। বাহিরে পায়খানা যাওয়ার অভ্যাস থাকিলে বাড়ী হইতে বহুদূরে যাওয়া চাই; সেখানে হাত পা অথবা হাত-কোদালি দিয়া ছোট রকমের একটি গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে মলত্যাগ করিয়া তার উপর মাটি চাপা দিবে।

যেখানে সেখানে প্রস্রাব করিয়াও আমরা হাওয়া দূষিত করি। এ অভ্যাস বিলকুল ত্যাগ করা দরকার। যদি প্রস্রাবের জন্য তেমন কোনো নির্দ্দিষ্ট স্থান না থাকে, তবে বাড়ী হইতে দূরে যাইয়া শুকনা জমির উপর প্রস্রাব করিয়া তার উপর ধূলা মাটি চাপা দিবে।

বেশী গভীর গর্ত্তে মল গাড়িবে না। ইহাতে তার উপর সূর্য্যের উত্তাপ কোনো কাজ করিতে পারে না; আর তার আশপাশে মাটির নীচে যে জলের ঝরণা বহে তাহাও খারাপ হইবার সম্ভাবনা আছে।

আমরা আঙিনায়, বারান্দায়, দেওয়ালের গায়ে, ফরাসের উপর— যেখানে সেখানে থুথু ফেলি। এ অভ্যাস বড় খারাপ। থুথু নানা প্রকারে বিষাক্ত হয়; বিশেষ ভাবে ক্ষয়রোগীর থুথুর ভিতর বহুত বিষাক্ত জীবাণু থাকে। ঐ জীবাণু বাতাসে মিশিয়া যায় এবং সেই বাতাস অপরে গ্রহণ করে। তাহার ফলে ঐ রোগ বিস্তৃত হয়। ইহা ভিন্ন থুথু ফেলার ফলে ঘর ইত্যাদি দুর্গন্ধ হইয়া যায়। বাড়ীতে থুথু ফেলার জন্য একটি পিকদানি রাখা উচিত। পথ চলার সময় শুকনা মাটিতে ধূলায় থুথু ফেলাই ঠিক; ইহাতে থুথু শুকাইয়া মাটির সহিত মিশিয়া যাইবে এবং কম ক্ষতি করিবে। অনেক ডাক্তার বলেন, কোনো পাত্রে জীবাণু নাশক ঔষধ দিয়া ক্ষয়রোগীর শুধু তাহার ভিতর থুথু ফেলা উচিত; কারণ ধূলির ভিতর ক্ষয়রোগীর থুথু ফেলিলেও উহার জীবাণু ধ্বংস হয় না, সে গুলি হাওয়ায় উড়িয়া লোকের অনিষ্ট করে। এ কথা সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, যেখানে সেখানে থুথু ফেলা যে খারাপ ও অনিষ্টকর তাহা ঠিক।

কেহ কেহ তরিতরকারীর খোসা, বাসি ভাত প্রভৃতি যেখানে সেখানে ফেলে। এগুলি সেখানে পড়িয়া পচে এবং বাতাসে দুর্গন্ধ ছড়ায়। যে সব জিনিষ পচিয়া যায় তাহা খোলা যায়গায় ফেলা ঠিক নহে। ছোট গর্ত্ত করিয়া এই সব জিনিষ তাহার ভিতর গাড়িয়া রাখিলে হাওয়া খারাপ হয় না, এবং অল্প দিনের মধ্যে ভাল সার প্রস্তুত হয়। ইচ্ছা থাকিলে এই অনুসারে চলা কিছু কঠিন নহে।

আমাদের কু অভ্যাসের ফলে হাওয়া কিরূপে দূষিত হয় এবং কিরূপে

তাহা বিশুদ্ধ রাখা যায় তাহা বুঝা গেল। কিরূপে হাওয়া গ্রহণ করিতে হয়, এখন তাহা আলোচনা করা হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, নাক দিয়া নিশ্বাস লওয়া সঙ্গত, মুখ দিয়া নহে। পরন্তু খুব কম লোকে ঠিক ভাবে নিশ্বাস গ্রহণ করে। অনেকে মুখ দিয়া নিশ্বাস লয়। এই অভ্যাস অনিষ্টকর। মুখ দিয়া বেশী ঠাণ্ডা হাওয়া লইলে সর্দ্দি হয়, গলা বসিয়া যায়। মুখ দিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করিলে হাওয়ার সহিত ফুসফুসের ভিতর ধূলিকণা প্রবেশ করে এবং ইহাতে প্রায়ই ফুসফুসের বিশেষ অনিষ্ট হয়। উদাহরণ স্বরূপ লণ্ডনের কথা বলা যাইতে পারে। নবেম্বর মাসে সেখানে খুব কুয়াসা পড়ে। কারখানার চিমনির ধুঁয়ার সহিত মিশিয়া ইহার রং হলদে হয়। ইহার ভিতর সূক্ষ্ম কাল ধূলিকণা থাকে। যাহারা এই হাওয়া মুখ দিয়া গ্রহণ করে, তাহাদের থুথুর ভিতর এই ধূলিকণা দেখা যায়। যাহাদের নাক দিয়া নিশ্বাস লওয়ার অভ্যাস নাই, এরূপ অনেক স্ত্রীলোক ইহার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য মুখের উপর জালিদার কাপড় বাঁধিয়া রাখে। উহাতে চালুনীর কাজ হয়। উহার ভিতর দিয়া হাওয়া সাফ হইয়া যায়; ঐ জাল পরীক্ষা করিলে উহাতে ধূলিকণা দেখা যায়। ভগবান আমাদের নাকের ভিতর এক প্রকার চালুনি দিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে, নাক দিয়া যে হাওয়া আমরা লই তাহা গরম হইয়া ভিতরে পৌছে। এ জন্য স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রত্যেকের নাক দিয়া নিশ্বাস লওয়া অভ্যাস করা উচিত। ইহা কঠিন কাজ নয়। কথা বলার সময় ভিন্ন অন্য সময় মুখ বন্ধ রাখা চাই। মুখ খোলা রাখিয়া যাহার ঘুমানর অভ্যাস আছে, সে যেন রাত্রে ঘুমের সময় মুখে পট্টী বাঁধিয়া শোয়; ইহাতে বাধ্য হইয়া সে নাক দিয়া নিশ্বাস লইবে।

সন্ধ্যায় ও সকালে খোলা হাওয়ায় দাঁড়াইয়া বিশ বার নাক দিয়া

লম্বা নিশ্বাস টানা দরকার। যাহারা সুস্থ এবং নাক দিয়া যাহারা শ্বাস লইয়া থাকেন, তাহারাও সর্ব্বদা বিশুদ্ধ হাওয়ায় এরূপ শ্বাস লইলে তাহাদের ছাতি মজুবুত ও চওড়া হইবে। ইহা প্রত্যেকে অভ্যাস করিতে পারেন। অভ্যাস করার পূর্ব্বে ছাতি মাপিয়া এক মাস পরে ফের মাপিলে দেখা যাইবে যে, এই কয়েকদিনেব ভিতর ছাতি পূর্ব্বাপেক্ষা চওড়া হইয়াছে। স্যাণ্ডো ইত্যাদির ডম্বলের ব্যায়ামের ইহাই রহস্য। ডম্বল ভাঁজিলে দীর্ঘশ্বাস তাড়াতাড়ি লওয়ার আবশ্যক হয়; ইহাতে ছাতি চওড়া ও মজবুত হয়।

শ্বাস লওয়ার প্রণালী শিক্ষা করার পর সর্ব্বদা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা দরকার। আমরা সাধারণত সারাদিন কোনো ঘর অথবা দোকানের ভিতর থাকি এবং রাত্রে সিন্দুকের মত কুঠুরীতে শুই। কুঠুরীর এক-আধটি জানালা অথবা দরজা থাকিলেও তাহা বন্ধ করিয়া লই। এইরূপ অভ্যাস খুব খারাপ। সব সময় যথাসম্ভব খোলা যায়গায় থাকা উচিত। এমন বারান্দা অথবা ময়দানে শুইবে যেখানে প্রচুর খোলা হাওয়া পাওয়া যায়। যাহাদের এ সুবিধা নাই, তাহারা যেন নিজেদের কুঠুরীর দরজা জানালা যথাসম্ভব খুলিয়া রাখেন। হাওয়া আমাদের চব্বিশ ঘণ্টার খোরাক; হাওয়া হইতে ভয়ের কোনো কারণ নাই। প্রাতঃকালের ঠাণ্ডা হাওয়ায় অথবা খোলা হাওয়ায় শ্বাস লইলে ব্যারাম হয়, এ ধারণা ভুল। যে ব্যক্তি খারাপ অভ্যাস দ্বারা ফুসফুসকে বিগড়াইয়া দিয়াছে, হঠাৎ মুক্ত বায়ু সেবন করিলে তাহার সর্দ্দি হইতে পারে; কিন্তু সেও যেন সর্দ্দিকে ভয় না করে। এই সর্দ্দি খুব শীঘ্র সারিয়া যায়। আজকাল য়ুরোপে ক্ষয়রোগীদের জন্য এরূপ ঘর বানানি হইয়াছে, যেখানে তাহারা সর্ব্বদা খোলা হাওয়া পায়। আমাদের দেশে মহামারীর উপদ্রব সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে। ইহার

একমাত্র কারণ, আমরা হাওয়া দূষিত করি এবং ঐ দূষিত হাওয়া গ্রহণ করি। মনে রাখিতে হইবে খোলা যায়গায় শ্বাস লইলে দুর্ব্বল লোকেরও লাভ হয়। খোলা হাওয়ায় শ্বাস লইলে ও হাওয়া শুদ্ধ রাখিলে আমরা অনেক রোগ হইতে সহজেই পরিত্রাণ পাইতে পারি।

খোলা যাওগায় শোয়া যেমন দরকার, মুখের উপর কোনো কাপড় না রাখিয়া মুখ আলগা রাখিয়া শোয়াও তেমনি দরকার। অনেকে মুখ ঢাকিয়া শুইয়া থাকে। ইহাতে যে হাওয়া তাহারা পরিত্যাগ করে সেই বিষাক্ত হাওয়াকেই আবার গ্রহণ করে। সুখের বিষয় গায়ে আমরা কাপড় যতই জড়াই না কেন, অল্প বিস্তর বাহিরের শুদ্ধ যাওয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করে। ইহা না হইলে যাহারা কাপড় মুড়ি দিয়া শোয়, তাহারা দমবন্ধ হইয়া মারা যাইত। আপাদমস্তক ঢাকিয়া শুইলেও কিছু বিশুদ্ধ হাওয়া ভিতরে প্রবেশ করে। কিন্তু ইহার পরিমাণ প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক কম। যদি মাথায় ঠাণ্ডা লাগে, তবে মাথায় কাপড় জড়াইয়া নাক বাহিরে রাখা দরকার। যত বেশী ঠাণ্ডা পড়ুক না কেন, কখনও নাক ঢাকিয়া শোয়া উচিত নহে।

হাওয়া ও আলোকের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, সে বিষয়ে এখানে কিছু বলা আবশ্যক। হাওয়া বিনা যেরূপ আমরা থাকিতে পারি না, ঐরূপ আলোক বিনাও জীবিত থাকিতে পারি না। নরককে অন্ধকার অর্থাৎ আলোকশূন্য পুরী বলা হয়। যেখানে আলোক প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানকার হাওয়া সর্ব্বদা খারাপ থাকে। কোনো অন্ধকার কুঠুরীতে প্রবেশ করিলে সেখানকার হাওয়ার দুর্গন্ধ বুঝা যায়। অন্ধকারে আমরা কিছু দেখিতে পারি না, ইহা হইতে বুঝা যায় যে, আলোকের ভিতর বাস করার জন্য আমরা সৃষ্ট হইয়াছি। প্রকৃতি আমাদের জন্য যতটা অন্ধকার দরকার বুঝিয়াছে ততটা সুখপ্রদ রাত

বানাইয়া দিয়াছে। কাহারও কাহারও এমন অভ্যাস আছে যে, অত্যন্ত গরমের দিনেও আলো ও বাতাস বন্ধ করিয়া ঘরে বসিয়া অথবা শুইয়া থাকে। যে ব্যক্তি হাওয়া ও আলোক শূন্য স্থানে থাকে সে দুর্ব্বল হয়।

আজকাল য়ুরোপে অনেক ডাক্তার শুধু 'সূর্য্য-স্নান' ও 'বায়ু-স্নান' দ্বারা রোগীদের আরোগ্য করিয়া থাকেন। রোগীদের প্রায় উলঙ্গ করিয়া রাখা হয় এবং সমস্ত শরীরে চামড়ার উপর আলোক ও হাওয়া সোজাসুজি লাগে। শত শত লোক এই চিকিৎসায় আরাম হয়। হাওয়া ও আলোক প্রবেশের জন্য ঘরের দরজা জানালা দিনরাত খোলা রাখা দরকার।

প্রশ্ন হইতে পারে, যদি হাওয়া ও আলোক এত প্রয়োজনীয় বস্তুই হয়, তবে যাহারা অন্ধকার কুঠুরীতে থাকে ও কাজ করে তাহাদের শরীর খারাপ হইয়াছে মনে হয় না কেন? যাহারা এ বিষয়ে ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছেন, তাহারা এ প্রশ্ন করিবেন না। আমরা তো পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভের পক্ষপাতী; যেন তেন প্রকারে বাঁচিয়া থাকিতে পারিলেই আমরা সন্তুষ্ট হইব না। প্রমাণ করা হইয়াছে যে, অল্প আলোক ও অল্প হাওয়ায় থাকিলে লোকের ব্যাধি হয়। হাওয়া ও আলোক কম জোটে বলিয়া সহরের লোকে গ্রামের লোকের অপেক্ষা দুর্ব্বল হয়। হাওয়া ও আলোক স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে যাহা কিছু বলা হইল, প্রত্যেকে যেন তাহা মনে রাখেন এবং তদনুসারে চলেন।

—চতুর্থ অধ্যায়—

জল

আমাদের জীবন ধারণের জন্য প্রথম দরকার হাওয়া, তার পর দরকার জল। বাতাস ছাড়া মানুষ কয়েক মিনিটের বেশী বাঁচিতে পারে না, কিন্তু জল বিনা লোকে কয়েক দিন পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। অন্য খাদ্যের অভাবে শুধু জলপান করিয়াই সে অনেক দিন জীবিত থাকিতে পারে। আমাদের শরীরের শতকরা ৭০ ভাগের বেশীর ভাগ জল। জলীয় অংশ বাদ দিলে শরীরের ওজন ৪ হইতে ৬ সের পর্য্যন্ত হয়। আমাদের সকল খাদ্যের ভিতর অল্প বিস্তর জল থাকেই।

জল এত প্রয়োজনীয় হইলেও ইহা পরিষ্কার রাখার জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করি না। হাওয়া এবং জল সম্বন্ধে কুছ-পরোয়া-নেই ভাবে চলি বলিয়া মহামারী প্রভৃতি আমাদের ঘিরিয়া রহিয়াছে। যুদ্ধে নিরত সৈন্যদের ভিতর প্রায়ই কালাজ্বর হয়। দূষিত জলপানই ইহার কারণ। যেখানে যেরূপ জল পাওয়া যায়, সৈন্যদের তাহাই পান করিতে হয়। সহরের লোকদেরও কখনও কখনও এই জ্বর হইতে দেখা যায়; অধিকাংশ স্থলে খারাপ জলপানই ইহার কারণ। দূষিত জলপানে অনেক সময় পাথুরী রোগ হয়।

দুটি কারণে জল দূষিত হয়—যে স্থান হইতে জল আসে তাহা নোংরা থাকিলে, আমরা নিজেরা জল খারাপ করিলে। খারাপ জায়গার জল মোটেই ব্যবহার করা উচিত নহে, আর আমরা তাহা প্রায়ই করি না; কিন্তু নিজেদের গাফিলতিতে দূষিত করা জল খাইতে

আমরা দ্বিধা বোধ করি না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, আমরা নদীতে নানা রকম জিনিষ ফেলি, তাহাতে স্নান করি ও জিনিষপত্তর ধোয়াপাওলা করি এবং সেই জল পান ও পাকের জন্য ব্যবহার করি। যেখানে স্নান করা অথবা কাপড়-চোপড় ধোয়া হয়, সে জল কখনও পান করিতে নাই। নদীর ভাটার দিকটা স্নান করা ও কাপড় কাচার জন্য এবং উপরের দিকটা পানের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিলে ভাল হয়। জল যে দিকে যায়, তার বিপরীত দিক হইতে পানীয় জল লওয়া উচিত।

নদীর ধারে কোনো সেনাদল ছাউনী ফেলিলে একজন সৈনিককে জল বিশুদ্ধ রাখার জন্য মোতায়েন রাখা হয়। যে দিক হইতে স্রোত আসে সেই দিকে কেহ স্নান করিলে বা ধোয়াপাওলা করিলে তাহার শাস্তি হয়। যেখানে এরূপ বন্দোবস্ত নাই, সেখানে চতুর ও পরিশ্রমী স্ত্রীলোকেরা নদীর বালুর ভিতর গর্ত্ত খুঁড়িয়া সেখান হইতে জল ভরিয়া লয়। এই রেওয়াজ খুব ভাল। ইহাতে জল বালু দ্বারা ছাঁকা হইয়া সাফ হয়।

কাঁচা কূয়ার জলে অনেক সময় অস্বাস্থ্যকর পদার্থ থাকে। এজন্য ইহা পান করা নিরাপদ নহে। কাঁচা কূয়ার জলে মাটীর ভিতরকার মলমূত্রের রস পর্য্যন্ত চুয়াইয়া মিশিয়া থাকে। কূয়ার ভিতর পাখী পর্য্যন্ত বাসা বাঁধে ও কখনও কখনও তাহার ভিতর পাখী মরিয়া ভাসিতে দেখা যায়। কূয়ার চারি ধার ভাল ভাবে বাঁধা না থাকিলে, যাহারা জল তোলে তাহাদের পায়ের ময়লা প্রভৃতি জলে মিশিয়া জল নষ্ট হয়। কূয়ার জল পানের সময় খুব সাবধান হওয়া দরকার। চৌবাচ্চায় যে জল ভরিয়া রাখা হয়, তাহা প্রায়ই খারাপ হয়। চৌবাচ্চার জল পরিষ্কার রাখিতে হইলে, তাহার উপর ঢাকনী রাখা দরকার,

উহা ঘন ঘন ধুইতে হইবে, যে পুষ্করিণী প্রভৃতি হইতে সেখানে জল আনা হয়, তাহাও সাফ রাখিতে হইবে।

জল পরিষ্কার রাখার জন্য অতি কম লোকে চেষ্টা করে। এই সব কারণে জল নির্ম্মল করার শ্রেষ্ঠ উপায় এই—আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত জল ভাল ভাবে ফুটাইবে এবং ঠাণ্ডা হওয়ার পর নাড়াচাড়া না দিয়া খুব সাবধানে মোটা পরিষ্কার কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া অপর এক পাত্রে ঢালিয়া তাহাই ব্যবহার করিবে। এখানেই কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। এ বিষয়ে আমাদের পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতিও আমাদের কর্ত্তব্য আছে। সাধারণের ব্যবহারের যে জল থাকে, কোনো পল্লীগ্রামে হউক অথবা শহরে হউক, তাহা সাধারণের সম্পত্তি; অতএব ঐ সম্পত্তি গচ্ছিত ধনের ন্যায় ব্যয় করা উচিত অর্থাৎ এমন কোনো কাজ যেন কেহ না করে যাহাতে এই সাধারণের ব্যবহার্য্য জল দূষিত হয়। প্রত্যেকের দেখা উচিত পানীয় জল কোনো প্রকারে কলুষিত না হয়। যে জল পানের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে সেখানে স্নান করা অথবা কাপড় ধোয়া অনুচিত; আমরা যেন জলাশয়ের তীরে মলমূত্র ত্যাগ না করি, অথবা সেখানে মড়া পোড়াইয়া তাহার ছাই জলে না ফেলি।

পানীয় জল পরিষ্কার রাখার সব উপায় অবলম্বন করা সত্ত্বে জল সম্পূর্ণরূপে সাফ রাখা কঠিন, কারণ জল নানা উপায়ে দূষিত হয়। ক্ষার অথবা পচা ঘাস প্রভৃতির অংশ জলের সহিত মিশিলে জল অপরিষ্কৃত হইয়া যায়। বৃষ্টির জল অবশ্য সর্ব্বাপেক্ষা নির্ম্মল; কিন্তু আমাদের কাছে পৌঁছিবার পূর্ব্বে হাওয়ার ভিতর যে ধূলিকণা প্রভৃতি থাকে তাহা উহাতে মিশিয়া যায়। পরিষ্কার জল শরীরের খুব উপকারী; এজন্য অনেক ইংরেজ ডাক্তার রোগীদের জন্য পরিশ্রুত জলের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। জলকে বাষ্পে পরিণত করিয়া এই জল তৈরী হয়। অজীর্ণ

রোগীদের পক্ষে এই জল খুব উপকারী। পরিশ্রুত জল এবং তাহার ব্যবহার সম্বন্ধে সংপ্রতি একখানি বই বাহির হইয়াছে। তাহাতে লেখা আছে, শুধু পরিশ্রুত জল ব্যবহার করিয়া অনেক রোগ সারে। ইহাতে অতিশয়োক্তি আছে; কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ম্মল জল যে শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী তাহা অবিশ্বাসযোগ্য নহে।

অনেকে জানে না যে জল দুই রকম—পাতলা ও ভারী। যে জলে লবণ জাতীয় পদার্থ মিশান থাকে তাহাকে ভারী বলা যায়। এইরূপ জলে সাবানের ফেনা ভাল হয় না এবং খাদ্যাদিও শীঘ্র সিদ্ধ হয় না। ভারীজল পান করিলে খাদ্য পরিপাক হওয়াও শক্ত, ভারী জল কটু এবং পাতলা জল মিঠা ও স্বাদযুক্ত। কেহ কেহ বলেন, ভারী জল বেশী পুষ্টিকর, তাহা পান করিলে বেশী উপকার হয়। কিন্তু হালকা জল পান করাই ভাল। বৃষ্টির জল স্বভাবত হালকা, তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং পানের পক্ষে প্রশস্ত। ভারী জল ফুটানর পর আধঘণ্টা উনানে বসাইয়া রাখিলে তাহা হালকা হইয়া যায়। উনান হইতে নামাইয়া তাহা ফিল্টার করিয়া পান করা যাইতে পারে।

অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন 'জল কখন ও কি পরিমাণে পান করা দরকার?' ইহার উত্তর—পিপাসা লাগিলে এবং পিপাসার নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জল পান করিবে। খাওয়ার সময় এবং খাওয়ার পরে জলপান করিলে কোনো ক্ষতি নাই। জল খাইলে খাদ্য তাড়াতাড়ি গলার নীচে নামিবে ইহা ভাবিয়া খাওয়ার সময় জল পান করা ঠিক নহে। যদি খাদ্য গলার নীচে নামিতে না চায়, তবে বুঝিবে তাহা ভাল ভাবে চর্ব্বিত হয় নাই অথবা পাকাশয় তাহাকে চায় না।

সাধারণত জলপানের কোনো দরকার নাই, এবং দরকার না হওয়াই উচিত। কারণ, আমাদের খাদ্যের ভিতর শত করা ৭০ ভাগ

জল আছে। অনেক খাদ্যে ইহার চেয়ে বেশী জল থাকে। এরূপ কোনো খাদ্য নাই যাহার ভিতর মোটেই জল নাই। ইহা ভিন্ন রান্নার সময় তো অনেক জল ব্যবহার করা হয়। তবে পৃথক ভাবে জলপানের প্রয়োজন কি? ইহার পুরা উত্তর খাদ্যের অধ্যায়ে দেওয়া যাইবে। এখানে সংক্ষেপে বলিতে পারি, যাহাদের খাদ্যে পিপাসা-বৃদ্ধিকর লঙ্কা, মসলা ইত্যাদি জিনিষ নাই, তাহাদের কম জল পান করিতে হয়। যে ব্যক্তি টাটকা ফল খায়, খালি জল খাওয়ার ইচ্ছা তাহার প্রায়ই হয় না। অকারণ পিপাসা ব্যাধির লক্ষণ।

যা-তাই জল পান করিয়া কাহারও কাহারও কোনো অনিষ্ট হয় না দেখিয়া আমাদেরও ঐরূপ করার ইচ্ছা হইতে পারে। হাওয়ার অধ্যায়ে এরূপ প্রশ্নের সমাধান করা হইয়াছে। আমাদের শরীরের ভিতরকার অনেক প্রকার বিষাক্ত পদার্থকে নষ্ট করার ক্ষমতা রক্তের আছে। ধারাল তলোয়ার ব্যবহারের পর যদি আমরা পুনরায় তাহার ধার না দি, তবে তাহা যেমন ঠিকমত কাজ দেয় না, রক্তের সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা খাটে—রক্তকে শুদ্ধ করিয়া তাহার বিষনাশক শক্তি বৃদ্ধি করা দরকার। সর্ব্বদা খারাপ জল পান করিয়া রক্ত দূষিত করিয়া ফেলিলে, রক্ত আপনার কাজ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে।

—পঞ্চম অধ্যায়—

খাদ্য

হাওয়া, জল ও অন্ন এই তিনটিই আমাদের খাদ্য। কিন্তু আমরা সাধারণত অন্নকেই খাদ্য মনে করি, এবং যাহারা ভাত, রুটী প্রভৃতি খায় তাহাদের অন্নভোজী বলি। হাওয়াই প্রথম আহার, ইহা বিনা কাহারও চলে না। দ্বিতীয় আহার জল—ইহার মূল্য অন্ন অপেক্ষা বেশী। এজন্য প্রকৃতিই আমাদের অন্ন অপেক্ষা বেশী জল দিয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর আহার অন্ন।

এই তৃতীয় শ্রেণীর আহার সম্বন্ধে কিছু লেখা কঠিন। খাদ্য সম্বন্ধে কোনো ধরা-বাঁধা নিয়ম করা চলে না। কি প্রকার খাদ্য, কি পরিমাণে এবং কত বার আমাদের খাওয়া দরকার, এ বিষয়ে ডাক্তারদের মতভেদ আছে। লোকের প্রকৃতি এত বিভিন্ন যে, একই খাদ্যের প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন লোকের উপর ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়। এ অবস্থায় ইহাই ঠিক, এরূপ বলা শুধু কঠিন নহে—অসম্ভবও বটে। দুনিয়ার কত জায়গায় মানুষ মানুষকে মারিয়া তার মাংস খায়—নরমাংসই তাহাদের খাদ্য। কত জনে শুধু দুধ খাইয়া বাঁচিয়া থাকে, দুধই তাহাদের খাদ্য। কোনো কোনো জীব বিষ্ঠা খাইয়া জীবিত থাকে, বিষ্ঠাই তাহাদের খাদ্য।

কি প্রকার খাদ্য খাওয়া উচিত, ইহার ঠিক উত্তর দেওয়া মুস্কিল হইলেও, প্রত্যেকেরই এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। বলা বাহুল্য যে, খাদ্য বিনা শরীর টিকিয়া থাকিতে পারে না। খাদ্য

সংগ্রহের জন্য আমরা অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করি। কেন আমরা খাদ্য গ্রহণ করি, তাহা আমাদের জানা উচিত। ইহা হইতে বুঝিতে পারিব, আমাদের কিরূপ খাদ্য খাওয়া উচিত। সকলেই স্বীকার করিবেন, হাজার করা নশ' নিরানব্বই জন রসনাতৃপ্তির জন্য খায়—পরে কি হইবে, খাওয়ার সময় সে কথা তাহাদের মনেই আসে না। বেশী খাওয়ার জন্য অনেকে জোলাপ লয় অথবা হজমী চূর্ণ ব্যবহার করে। কোনো কোনো লোক অতিরিক্ত মাত্রায় সুস্বাদ জিনিষ খায়; পরে আবার উহা খাওয়ার জন্য ভুক্ত দ্রব্য বমি করিয়া ফেলে। কেহ কেহ এত অধিক খায় যে, দুই তিন দিন তাহাদের আর কিছুই খাইতে হয় না। অতি ভোজনের ফলে লোককে মরিতেও দেখা গিয়াছে। এ সব ব্যাপার আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমার জীবনেই অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কতকগুলি ঘটনার কথা মনে পড়িলে আমার হাসি পায়, আবার কতকগুলির জন্য লজ্জা হয়। এমন এক সময় গিয়াছে যখন প্রাতঃকালে আমি চা পান করিতাম, দুই তিন ঘণ্টা পরে নাস্তা (প্রাতর্ভোজন) করিতাম, একটার সময় মধ্যাহ্নভোজন করিতাম, ৩ টায় আবার চা খাইতাম, পরিশেষে ৬।৭ টার ভিতর সান্ধ্যভোজন শেষ করিতাম। ঐ সময় আমার শরীরের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। শরীরে অনেক মেদ জমিয়াছিল। ঔষধের বোতল সব সময় কাছেই থাকিত। বেশী খাওয়ার জন্য জোলাপ লইতাম এবং শরীরের পুষ্টিবিধানের জন্য কয়েক প্রকার ঔষধ খাইতাম। এখন আমি যে কাজ করিতে পারি, তখন আমার যৌবনকালে তার এক তৃতীয়াংশ কাজও করিতে পারিতাম না। এরূপ জীবন নিশ্চয়ই করুণাজনক, এবং গভীরভাবে চিন্তা করিলে ইহাকে নীচ, পাপপূর্ণ এবং ঘৃণিত মনে হইবে।

খাওয়ার জন্য মানুষের জন্ম হয় নাই, অথবা খাওয়ার উদ্দেশ্যেই সে বাঁচিয়া থাকে না। তাহার প্রকৃত কার্য্য তাহার স্রষ্টাকে জানা ও তাঁহার সেবা করা। এ কাজের জন্য শরীর দরকার এবং আহার বিনা শরীর থাকে না; এজন্য আমাদের খাওয়া দরকার। আস্তিকের পক্ষে এই যুক্তি যথেষ্ট। নাস্তিকেরা পর্য্যন্ত স্বীকার করিবেন যে, শুধু স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই আমাদের খাওয়া উচিত, অতএব প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়া ঠিক নহে।

পশুপক্ষীদের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, তাহারা কখনও স্বাদের জন্য খায় না, অতিভোজন করে না, ক্ষুধা হইলে যতক্ষণ না ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত খায়। তাহারা রাঁধিয়াও খায় না; প্রকৃতির প্রস্তুত খাদ্য হইতে নিজেদের অংশ গ্রহণ করে। শুধু মানুষই কি রসনাতৃপ্তির জন্য সৃষ্ট হইয়াছে? শুধু মানুষই কি চিরকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিবে? যে সব জানোয়ার স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করে, তাহারা কখনও আহার অভাবে মরে না। তাহাদের ভিতর ধনী দরিদ্রের ভেদ নাই—কেহ দিনের মধ্যে অনেকবার খাইল, কেহ একবারও খাইতে পাইল না, এরূপ ব্যাপার ঘটে না। এই অস্বাভাবিক ব্যাপার শুধু মানব সমাজে দেখা যায়। তবু আমরা পশুপক্ষীদের অপেক্ষা নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করি! বাস্তবিক যাহারা পেট-পূজাই সার ভাবিয়াছে তাহারা পশুপক্ষী অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

একটু শান্তভাবে বিচার করিলে জানিতে পারিব যে, রসনার দাস হওয়ার জন্যই আমরা মিথ্যাকথা বলি, প্রবঞ্চনা এবং চুরি করি। জিহ্বাকে সংযত রাখিতে পারিলে অপর ইন্দ্রিয়সকলকে বশে রাখা আমাদের খুব সহজ হয়। কিন্তু আমরা বেশী খাওয়া এবং সুস্বাদু দ্রব্য ভোজন করাকে পাপ মনে করি না। মিথ্যা বলিলে, চুরি করিলে,

ব্যভিচার করিলে লোকে আমাদের ঘৃণা করে। এসব বিষয়ে অনেক নীতিগ্রন্থ লেখা হইয়াছে ; কিন্তু রসনা সংযত করা সম্বন্ধে কোনো পুস্তক লেখা হয় নাই—যেন খাওয়ার সহিত নীতি-দুর্নীতির কোনো সম্পর্ক নাই। ইহার প্রধান কারণ আমরা সকলেই এই দোষে দোষী—সকলেই জিহ্বার দাস। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও রসনাকে বিলকুল নিজেদের অধীন করিতে পারেন নাই। অতি মাত্রায় আহারের ভিতর তাঁহারা কোনো দোষ দেখেন নাই। তাঁহারা বড়জোর লিখিয়াছেন, ইন্দ্রিয়-গণকে বশে রাখার জন্য যথাসম্ভব মিতাহারী হওয়া দরকার। কিন্তু তাঁহারা লেখেন নাই যে, রসনার অধীন হইলে আরও অনেক কু অভ্যাসের দাস হইতে হয়। সকল সভ্য লোকে চোর, ঠক, ও ব্যভিচারীর সঙ্গ পরিত্যাগ করেন ; কিন্তু তাঁহারা অতি মাত্রায় আহার করেন এবং ইহাকে পাপের মধ্যে গণ্য করেন না। যে গ্রামে সকলে ডাকাত, সে গ্রামের লোকে ডাকাতিকে যেমন পাপ মনে করে না, সেইরূপ আমরা সকলেই রসনার দাস বলিয়া, এই দাসত্বকে পাপের মনে করি না। আরও দুঃখের বিষয়, ইহাকে আমরা গৌরবের বিষয় মনে করি। বিবাহ প্রভৃতি উৎসবের সময় আমরা ভাল ভাল খাবার তৈরী করি। এমন কি শ্রাদ্ধের সময়ও এরূপ করিতে লজ্জিত হই না। কোনো পরব উপস্থিত হইলে কিংবা অতিথি আসিলে, মিঠাই তৈরী করিবই। পাড়াপড়শী আত্মীয়-স্বজনকে যখন তখন নিমন্ত্রণ না করিলে অথবা তাহাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ না খাইলে আমরা অবজ্ঞার পাত্র হইব। নিমন্ত্রিতদের অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে না খাওয়াইলে আমরা কৃপণ বলিয়া গণ্য হইব। ছুটির দিনে ও রবিবারে মসলাযুক্ত গুরুপাক দ্রব্য আমাদের খাইতেই হইবে। বাস্তবিক যাহা পাপ তাহাকেই আমরা জ্ঞানের চিহ্ন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। আহার সম্বন্ধে আমরা এমন

সব মিথ্যা ধারণা পোষণ করি যে, আমাদের দাসত্ব ও পশুত্বকে আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। এই সঙ্কট হইতে আমরা কিরূপে মুক্ত হইব ?

এখন আর এক দিক দিয়া চিন্তা করা যাক। মানুষ, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি সব প্রাণীর জন্য প্রকৃতি প্রত্যহ যথেষ্ট খাদ্য উৎপন্ন করে। ইহা প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম। প্রকৃতির দরবারে কোনো ভুলচুক হয় না। সেখানে কেহ ঘুমায় না, আলস্য করে না; সেখানকার কার্য্য হরদম একভাবে চলে। এজন্য প্রকৃতিকে সারা দিন অথবা সারা বছরের জন্য নিজের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া রাখিতে হয় না। প্রকৃতির এই নিয়ম বুঝিয়া সেই অনুসারে আমরা যদি কাজ করি, তবে কাহাকেও অনাহারে মরিতে হইবে না। সংসারের সকল জীবজন্তুর যতটা খাদ্য প্রয়োজন, প্রকৃতি প্রত্যহ ততটা খাদ্য উৎপন্ন করে, তাহার বেশী উৎপন্ন করে না। যদি কেহ নিজের অংশ অপেক্ষা অধিক গ্রহণ করে, অথবা যাহা খাওয়া উচিত নহে তাহা খায়, তবে অন্যের ন্যায্য অংশে ততটা কম পড়িবে। রাজা মহারাজা এবং ধনবানেরা তাঁহাদের নিজেদের ও চাকরবাকরদের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য প্রস্তুত করান; অর্থাৎ তাঁহারা গরীবদের ততটা খাদ্য হইতে বঞ্চিত করেন। তবে গরীবেরা না খাইয়া মরিবে না কেন ? ইহা সত্য হইলে—এবং অত্যন্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও ইহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করেন—বলা চলে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত যতটা খাদ্য আমরা গ্রহণ করি, ততটা খাদ্য আমাদের চুরি করা হয়। অথা সোনী ঠিকই বলিয়াছেন, 'চুরি করা ধন আর অন্ন কাঁচা পারার ন্যায়।' জিহ্বার তৃপ্তির জন্য আমরা যাহা খাইব, কাঁচা পারার ন্যায় তাহা কোনো না কোনো রূপে শরীর হইতে ফুটিয়া বাহির হইবে—আমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট

ও দুঃখ বৃদ্ধি করিবে। কিরূপ খাদ্য কি পরিমাণে খাওয়া দরকার তাহা এখন আলোচনা করিব।

কিরূপ খাদ্য আমাদের খাওয়া দরকার তাহা স্থির করার পূর্ব্বে, কি কি খাদ্য আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর ও ত্যাজ্য তাহা আলোচনা করিব। মুখের পথে শরীরের ভিতর যাহা গ্রহণ করি সে সকলকে 'খাদ্য' বলিব। এই অর্থে মদ, ভাঙ, আফিম, তামাক, চা, কফি, কোকো এবং মসলা ইত্যাদিও খাদ্য। কতকটা নিজের এবং কতকটা অন্যের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি, এই সব জিনিষ সম্পূর্ণ বর্জ্জনযোগ্য।

জগতের সকল ধর্ম্মই লোককে মদ ও ভাঙ খাইতে নিষেধ করিয়াছে; কিন্তু অতি অল্প লোকেই ইহা খায় না। মদের জন্য হাজার হাজার পরিবার উৎসন্ন গিয়াছে; লক্ষ লক্ষ লোক ধ্বংস হইয়াছে। মাতালের কোনো জ্ঞান থাকে না; সে অনেক সময় মা, বোন এবং স্ত্রীর পার্থক্য ভুলিয়া যায়। মদে মানুষের পাকস্থলী জ্বলিয়া পুড়িয়া যায়। মদ্যপায়ীর জীবন তাহার কাছে ভারস্বরূপ হইয়া পড়ে। মাতালদের অনেক সময় নর্দ্দমায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। বুদ্ধিমান লোকেও মদের নেশায় জড়বৎ হইয়া যান; মদের নেশা যখন তাহাদের থাকে না, তখনও তাহাদের দ্বারা কোনো কাজ হয় না। কেহ কেহ বলেন, ঔষধ রূপে মদ খাইলে কোনো ক্ষতি নাই। মদের আড্ডা য়ুরোপে ডাক্তাররা পূর্ব্বে অনেক রোগেই মদ ব্যবহার করিতেন; কিন্তু এখন তাঁহারা এই মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন—ঔষধ রূপে মদের ব্যবহার সেখানে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়াছে। মদের পক্ষপাতী কেহ কেহ বলেন, মদ যখন ঔষধরূপে ব্যবহার করিলে কোনো দোষ হয় না, তখন ইহা পান করিলেও দোষ হয় না। কিন্তু অনেক বিষও তো ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়; আমরা

স্বপ্নেও কি সে সব খাওয়ার কথা ভাবি? কতকগুলি রোগে মদে উপকার করিতে পারে, তথাপি ইহাতে এত ক্ষতি হয় যে, কোনো চিন্তাশীল লোক কোনো অবস্থায় যেন ইহা ঔষধ রূপেও ব্যবহার না করেন। যে জিনিষ লক্ষ লক্ষ জীবন নষ্ট করিয়াছে, তাহা ব্যবহার করিয়া জীবন রক্ষা করা অপেক্ষা এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর ত্যাগ করা উচিত। সৌভাগ্যের বিষয় ভারতে এরূপ লক্ষ লক্ষ নর-নারী আছেন যাঁহারা ডাক্তারের পরামর্শেও এক ফোঁটা মদ খাইবেন না—যাহাকে তাঁহারা অভক্ষ্য মনে করেন, প্রাণরক্ষার জন্যও তাঁহারা তাহা খাইবেন না। আফিমও মদের চেয়ে কম অনিষ্টকর নয়; ইহাও মদের ন্যায় ত্যাজ্য। চীনাদের মত একটা বিরাট জাতি আফিমের প্রভাবে পড়িয়া কিরূপে মনুষ্যত্ব খোয়াইতেছে * এবং দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া পড়িতেছে, তাহা কি আমরা দেখিতেছি না? আমাদের দেশের জায়গীরদারগণ আফিমের পাল্লায় পড়িয়া কিভাবে আপন আপন জায়গীর হারাইয়াছেন, তাহা কি আমরা জানি না?

মদ, ভাঙ, ও আফিমের অনিষ্টকারিতার কথা সহজেই লোকে বুঝিতে পারে, কিন্তু তামাক ও সিগারেটের অপকারিতা সহজে বুঝে না। তামাক ও সিগারেট মানুষের মনে এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, তাহা নষ্ট করিতে এক যুগ লাগিবে। খুব ভাল লোকেও ইহা ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করেন না। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের অভ্যর্থনার সময় তামাক-সিগারেট চাই। দিন দিন ইহার প্রসার বাড়িতেছে, মনে

* চীনাদের মোহ ভাঙ্গিয়াছে। যে সব খ্রীষ্টান দয়া করিয়া চীনাদের আফিম খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে দেশ হইতে বিদায় দিবার জন্য চীনারা প্রস্তুত হইতেছে—অনুবাদক।

হয় কালে সকলেই ইহার কবলে পড়িবে। সকলকে সিগারেট ধরাইবার জন্য সিগারেট প্রস্তুতকারীগণ যে সব কৌশল অবলম্বন করে, অতি অল্প লোকে তাহা জানে। তাহারা তামাকের উপর আফিমের জল ও সুগন্ধি দ্রব্য ছড়াইয়া দেয়, ফলে নেশার মোহে ইহা ত্যাগ করা আরও মুস্কিল হইয়া পড়ে। বিজ্ঞাপনের জন্য তাহারা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে। য়ুরোপে অনেক সিগারেট কোম্পানী ব্যবসা বিস্তৃতির জন্য নিজেদের ছাপাখানা বায়স্কোপ ইত্যাদি রাখে, অনেক প্রকার পুরস্কার বিতরণ করে, লটারি খেলে; এক কথায় উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তাহারা জলের ন্যায় টাকা খরচ করে। স্ত্রীলোকেও এখন ধূমপান সুরু করিয়াছে। তামাকের প্রশংসা গাহিয়া কবিতা রচিত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে তামাক 'দরিদ্র-বন্ধু'।

তামাকে যে কত অনিষ্ট করে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যাহারা তামাকখোর তাহারা ইহার এমন দাস হইয়া পড়ে যে, অন্যের বাড়ীতে গিয়া তাহাদের অনুমতি না লইয়া নির্লজ্জের মত দুর্গন্ধ ধুঁয়া উড়াইতে সুরু করে। প্রায়ই দেখা যায় যাহারা ধূমপান করে, তাহারা নানা রকম অপরাধ করে। বালকেরা মা-বাপের পয়সা চুরি করে; এমন কি জেলখানার কয়েদীরা সিগারেট বিড়ি প্রভৃতি চুরি করিয়া সাবধানে লুকাইয়া রাখে। ধূমপানকারীরা না খাইয়া বরং থাকিতে পারে, কিন্তু তামাক সিগারেট ভিন্ন তাহাদের চলে না! সিগারেট না পাইলে সিগারেটখোর সিপাহী যুদ্ধক্ষেত্রেও স্ফূর্তি হারাইয়া কাজের অযোগ্য হইয়া পড়ে।

সিগারেট সম্বন্ধে টলষ্টয় লিখিয়াছেন—এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে খুন করার মতলব করে। সে ছোরা হাতে করিয়া তাহাকে হত্যা করিতে যাইতেছিল; হঠাৎ অনুতপ্ত হইয়া পশ্চাৎপদ হইল। তখন সে সিগারেট

খাইতে বসিল। সিগারেটের বিষ তাহার বুদ্ধিকে ঘোলাইয়া দিল; তখন সে বাস্তবিক খুন করিল। টলষ্টয় বলিতেন, মদ অপেক্ষা তামাকের প্রভাব বেশী এজন্য কোনো কোনো বিষয়ে ইহা বেশী অনিষ্টকর।

সিগারেটের জন্য যে খরচ হয় তাহাও কম নহে। আমি এমন লোকও দেখিয়াছি যাহারা সিগারেটের পিছনে মাসে ৭৫৲ পচাত্তর টাকা পর্য্যন্ত খরচ করে।

ধূমপান করিলে হজমশক্তি কমিয়া যায়, জিহ্বার স্বাদগ্রহণের ক্ষমতা থাকে না এবং খাদ্য বিস্বাদ মনে হয়; সুতরাং খাদ্যের ভিতর বেশী মসলা ব্যবহার করিতে হয়। ধূমপানকারীর নিশ্বাসের সহিত দুর্গন্ধ বাহির হয়, কখনও কখনও তাহার মুখে ফোস্কা পড়ে, দাঁত ও মাড়ি কাল কিংবা হল্‌দে হইয়া যায়। এজন্য অনেকে ভয়ঙ্কর ব্যাধিতে পর্যান্ত আক্রান্ত হয়। তামাকের ধূঁয়া হাওয়া দূষিত করে, সুতরাং ইহা সাধারণের স্বাস্থ্যহানি করে। যাহারা মদের নিন্দা করে, তাহারা কিরূপে তামাক খায় তাহা আমি বুঝিতে পারি না। তামাকের বিষ সূক্ষ্ম বলিয়া হয় তো লোকে ইহা ব্যবহার করে। আমি এ কথা বলিতে একটুও ইতস্ততঃ করিতেছি না যে, যিনি সর্ব্বপ্রকারে তামাক বর্জ্জন না করেন, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারেন না।

মদ, ভাঙ, তামাক প্রভৃতি নেশার জন্য অর্থ এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। ইহা নীতিজ্ঞানকে শিথিল করিয়া সংযমের শক্তিকে নষ্ট করে।

সকলে আমার সহিত একমত না হইলেও আমাকে বলিতে হইবে কোকো, চা, কফিও অনিষ্টকর। ইহাদেরও এক প্রকার মাদকতা শক্তি আছে। চা ও কফির সহিত দুধ ও চিনি না মিশাইলে ইহার ভিতর পুষ্টিকর কিছুই থাকে না। শুধু চা ও কফি খাইয়া বাঁচিয়া থাকা যায়

কি না সে পরীক্ষা অনেকবার হইয়া গিয়াছে। প্রমাণিত হইয়াছে চা ও কফির ভিতর রক্তবৃদ্ধিকর কিছুই নাই।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কালেভদ্রে কোনো বিশেষ উপলক্ষে আমাদের ভিতর চা কফির ব্যবহার হইত। কিন্তু সভ্যতার আলোকে চা কফি চলিত হইয়া পড়িয়াছে। এখন কেহ শুধু দেখা করিতে আসিলে আমরা তাহাকে চা কফি খাওয়াই। আমরা যখন তখন চা-পার্টি দেই। লর্ড কুর্জ্জনের সময় হইতে চা বহু প্রচলিত হইয়াছে। তাঁহার প্ররোচনায় বেশী চা উৎপন্ন হয় এবং ঘরে ঘরে ইহার ব্যবহার হইতেছে। লোকে স্বাস্থ্যকর জিনিষের পরিবর্ত্তে এখন অস্বাস্থ্যকর চা-কফি পান করা সুরু করিয়াছে।

সৌভাগ্যের বিষয় কোকোর দাম বেশী বলিয়া ইহা চা কফির ন্যায় চলিত হয় নাই। কিন্তু সৌখীন পরিবারে ইহারও বিশেষ আদর বাড়িয়াছে।

চা, কফি ও কোকো—এই তিনটিই হজমশক্তি কমায়। এগুলি নেশার জিনিষ, একবার ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলে আর ছাড়া যায় না। আমি নিজে যখন চা খাইতাম, তখন সময়মত চা না পাইলে আমার আলস্য বোধ হইত। ইহা নেশার পাকা লক্ষণ। একটি উৎসবে প্রায় চারিশত স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা উপস্থিত ছিল। নিমন্ত্রণকর্ত্তা স্থির করিয়াছিলেন, কাহাকেও চা অথবা কফি দিবেন না। ঐ সব স্ত্রীলোকের ঠিক চারটার সময় চা খাওয়ার অভ্যাস ছিল। কর্ত্তৃপক্ষকে জানান হইল, চা না পাইলে স্ত্রীলোকেরা অসুস্থ হইয়া পড়িবেন, তাঁহারা চলাফেরা করিতে পারিবেন না। কর্ম্মকর্ত্তা বাধ্য হইয়া পূর্ব্ব সঙ্কল্প বদলাইলেন। চা প্রস্তুত হইতে লাগিল, কিন্তু একটু দেরী হওয়ায় শোরগোল উঠিল—"শীগগির চা আনুন। শীগগির চা আনুন।" তাঁহাদের মাথা গরম হইয়া উঠিল, এক মিনিট তাঁহাদের নিকট এক মাসের মত

দীর্ঘ ঠেকিতে লাগিল। চা পাইয়া মহিলারা শান্ত হইলেন, তাঁহাদের চেহারা ফিরিল। ইহা সত্য ঘটনা। চা-পানের জন্য জনৈক মহিলার ভাল হজম হইত না ও সর্ব্বদা মাথা ধরিত। চা ছাড়িয়া দিতেই তাঁহার শরীর সুস্থ হইয়া উঠে। ইংলণ্ডের ব্যাটারসি মিউনিসিপালিটির একজন ডাক্তার ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়া বলিয়াছেন যে, "অতি মাত্রায় চা খাওয়ার ফলে তাঁহার এলাকার হাজার হাজার স্ত্রীলোকের 'জ্ঞানতন্তু' রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।" আমি অনেককে চা খাইয়া শরীর নষ্ট করিতে দেখিয়াছি। চা স্বাস্থ্যের বহুত ক্ষতি করে।

কফি সম্বন্ধে একটি দোহা প্রচলিত আছে :—

দূর করে বায়ু কফ, করে ধাতু বলহীন
রক্ত করে জল ; গুণ দুই, দোষ তিন।

এই দোহাটি বিলকুল ঠিক মনে হয়। কফ ও বায়ু দূর করার শক্তি কফিতে আছে, কিন্তু ইহা বীর্য্য পাতলা ও রক্ত জল করিয়া শরীর নষ্ট করিয়া ফেলে। কফ ও বায়ু দূর করার জন্য যাহারা কফি পান করেন, তাহারা উহার পরিবর্ত্তে আদার রস খাইলে বেশী উপকার পাইবেন। যাহাতে উপকার অপেক্ষা অপকার অনেক বেশী তাহা ত্যাগ করাতেই আমাদের কল্যাণ হইবে।

কফির ন্যায় কোকোরও এই সব দোষ আছে। ইহা চায়ের ন্যায় চামড়ার অনুভব শক্তি কমাইয়া দেয়।

যাহারা স্বাস্থ্য বিষয়ক অলোচনার ভিতর নীতিধর্ম্ম থাকা উচিত মনে করেন, তাহারা যেন মনে রাখেন, অধিকাংশ স্থলে চা, কফি ও কোকো চুক্তিবদ্ধ মজুর দ্বারা উৎপন্ন হয়। ক্রীতদাস না বলিয়া ইহাদের একটি মোলায়েম নাম দেওয়া হইয়াছে। বাস্তবিক ক্রীতদাস আর চুক্তিবদ্ধ কুলীর ভিতর কোনো পার্থক্য নাই। যেখানে কোকো উৎপন্ন

হয়, সেখানে মজুরদের উপর যে জুলুম করা হয়, তাহা স্বচক্ষে দেখিলে কাহারও কোকো খাইবার ইচ্ছা থাকিবে না। কোকোর বাগানের জুলুম সম্বন্ধে বড় বড় বই লেখা হইয়াছে। আমাদের প্রত্যেকটি খাদ্য কি ভাবে প্রস্তুত হয় তাহার খুঁটিনাটি বিবরণ জানিলে শতকরা নব্বই ভাগ খাদ্য ত্যাগ করিতে হইবে।

চা, কফি ও কোকোর পরিবর্ত্তে নীচের প্রণালীতে একটি নির্দ্দোষ ও পুষ্টিকর পানীয় বানান যায়। যাহারা খুব কফি পানে অভ্যস্ত তাহারাও ইহা পান করিলে বুঝিতে পারিবে না যে, ইহা কফি নহে। পরিষ্কার তাওয়া অথবা কড়াইয়ে গম দিয়া চুল্লীর উপর চড়াইয়া উত্তমরূপে ভাজিতে থাকিবে। লাল হইয়া কাল রং ধরিতে থাকিলে উনান হইতে নামাইবে, এবং জাঁতায় উত্তমরূপে পিষিয়া গুঁড়া করিবে। ইহার এক চামচ পেয়ালায় ফেলিয়া তার ভিতর ফুটন্ত জল দিবে। যদি ইহা এক মিনিট তক চুল্লীর উপর রাখা যায়, তবে আরও ভাল হয়। প্রয়োজন হইলে ইহার সহিত দুধ চিনি মিশান চলে। দুধ চিনি ছাড়াও ইহা পান করা যায়। সকলে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। চা কফি ও কোকোর পরিবর্ত্তে যিনি ইহা ব্যবহার করিবেন, তাহার পয়সাও বাঁচিবে স্বাস্থ্যও রক্ষা হইবে। যাহারা এই গুঁড়া প্রস্তুত করিতে পারিবেন না, তাহারা সত্যাগ্রহ আশ্রম, আমেদাবাদ হইতে ইহা আনাইতে পারেন।

আমাদের খাদ্য কিরূপ হওয়া উচিত, তাহাই এখন আলোচনা করিব। খাদ্য হিসাবে সমগ্র মানবজাতিকে তিনটি * প্রধান ভাগে

---

* একটু পরেই দেখা যাইবে, গান্ধীজী খাদ্য হিসাবে মানবজাতিকে চার শ্রেণীতে ভাগ করিয়া বসিয়াছেন। যথা—(১) ফল ভক্ষণকারী, (২) ফল ভিন্ন অন্য নিরামিষভোজী (৩) মিশ্র খাদ্য গ্রহণকারী অর্থাৎ মাছ মাংস ও নিরামিষভোজী এবং (৪) শুধু মাছ-মাংস-ভোজী—অনুবাদক।

ভাগ করা যায়। (১) প্রথম বিভাগ—এ বিভাগের লোক সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ইহারা স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্য হইয়া কেবলমাত্র নিরামিষ দ্রব্য খাইয়া জীবন ধারণ করে। ভারতবর্ষ, য়ুরোপ, চীন, জাপানের অধিকাংশ লোক এই বিভাগের ভিতর পড়িবে। এই বিভাগের অতি অল্প লোকে ধর্ম্মের প্রেরণায় ফলমূলাদি খাইয়া থাকে, বাকী লোকে মাংসাদি পায় না বলিয়া নিরামিষ খায়; মাংস পাইলে তাহারা মজা করিয়া খায়। ইটালি, আয়র্ল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ডের অধিকাংশ লোক, রাশিয়ার গরীব লোক, এবং চীন জাপানের প্রায় সকলে এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইটালিয়ানদের প্রধান খাদ্য ম্যাকারনি, আইরিশদের আলু, স্কচদের ওটমিল (জই) এবং চীনা ও জাপানীর ভাত। (২) দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক মিশ্র খাদ্যের উপর নির্ভর করে। ইহারা এক বা একাধিকবার উদ্ভিজ্জ দ্রব্য কয়েক প্রকার মাছ-মাংসের সহিত সর্ব্বদা খাইয়া থাকে। ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোক, ভারতবর্ষের অবস্থাপন্ন মুসলমান, যে সব ধনবান হিন্দু মাংস খাওয়াকে ধর্ম্মের দৃষ্টিতে দোষের মনে না করে তাহারা এবং ধনবান চীনা ও জাপানীরা এই বিভাগে পড়িবে। এই বিভাগের লোক সংখ্যাও যথেষ্ট, কিন্তু প্রথম বিভাগের তুলনায় অনেক কম। (৩) তৃতীয় বিভাগে পড়িবে হিম-মণ্ডলের অসভ্য জাতি সমূহ। ইহারা শুধু মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহাদের সংখ্যা খুব কম। য়ুরোপের সভ্য জাতিদের সংস্পর্শে আসিলেই ইহারা কিছু উদ্ভিজ্জ খাদ্য খাওয়াও আরম্ভ করে। মানুষ তিন প্রকার খাদ্য খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে; ইহাদের কোন্‌টি আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বাস্থ্যকর তাহা এখন দেখিতে হইবে।

মানবদেহের গঠন দেখিলে মনে হয়, প্রকৃতি মানুষকে নিরামিষভোজী করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলাহারী জন্তু ও মানুষের আভ্যন্তরীণ

যন্ত্রাদির বহুত মিল আছে। উদাহরণ স্বরূপ বানরের কথা বলা যাইতে পারে। ইহার আকার ও গঠন মানুষের ন্যায়; ইহারা ফল খাইয়া থাকে। ইহাদের দাঁত ও পাকস্থলী ঠিক মানুষের দাঁত ও পাকস্থলীর ন্যায়। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি মাংসাশী জন্তুর দাঁত ও পাকাশয় সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। আমাদের হাত তাহাদের থাবার মত নহে। গরু প্রভৃতি পশুর সহিত আমাদের কিছু সাদৃশ্য আছে, কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ঘাস খাওয়ার জন্য তাহাদের যেরূপ অন্ত্র আছে, আমাদের তাহা নাই।

এই সব দেখিয়া অনেক বৈজ্ঞানিক বলেন যে, মানুষ মাংসাহারী নহে। তাঁহারা ইহাও বলেন, মানুষ যে শুধু সকল প্রকার উদ্ভিজ্জ খাইয়া জীবনধারণ করিবে তাহাও নহে। তাঁহাদের মতে মানুষ প্রধানত ফলমূল খাইয়া জীবন রক্ষা করিবে।

এই মত সত্য হইলে বলা চলে যে, বর্ত্তমানে খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য আমরা অনেক মূল্যবান সময় অনর্থক ব্যয় করিতেছি। যদি আমরা শুধু কাঁচা খাদ্য খাইয়া থাকিতে পারিতাম, তবে আমাদের যথেষ্ট সময় ও পয়সা বাঁচিত এবং আমরা ইহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিতাম।

কেহ কেহ বলিবেন, লোক না রাঁধিয়া খাদ্য গ্রহণ করিবে কি না তাহা লইয়া এখন কল্পনা জল্পনা করা বৃথা, কারণ তাহাদের ইহা করার কোনো সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মানুষ ইহা করিবে কি না, তাহা লইয়া আমরা অলোচনা করিতেছি না, তাঁহাদের কি করা উচিত আমরা তাহা বলিতেছি। আমাদের আদর্শ খাদ্য কি, তাহা যখন আমরা জানিতে পারিব, মাত্র তখনই আমরা আদর্শের দিকে ক্রমে যাইতে পারিব। যখন বলি ফল-আহারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তখন অবশ্য আমরা আশা করি না যে, সকলেই এই পথে চলিবে। আমাদের বলার উদ্দেশ্য এই, যদি সকলে ইহা পারে, তবে খুব ভাল হইবে।

য়ুরোপে এ বিষয়ে অনেক পুস্তক লেখা হইয়াছে। অনেক ইংরেজ ফলাহারের ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এবং নিজেদের অভিজ্ঞতার ফল প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা ধর্ম্মলাভের জন্য ফলাহারী হন নাই, স্বাস্থ্যলাভের জন্য হইয়াছেন। জুষ্ট নামে জনৈক জার্ম্মান পণ্ডিত ফলাহার সম্বন্ধে একখানি খুব ভাল বই লিখিয়াছেন। বহু যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা তিনি ফলকে খুব উত্তম খোরাক বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। শুধু খোলা হাওয়া ও ফলাহার ব্যবস্থার দ্বারা তিনি অনেক ব্যারাম ভাল করিয়াছেন। তিনি একথা পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, যে দেশে ফল জন্মে সে দেশে মানুষ পুষ্টির জন্য যাহা কিছু দরকার তাহা সব পায়।

এখানে আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলিলে দোষের হইবে না। ছয় মাস হইতে ভাত রুটি, দুধ দই আমি খাই নাই; কেবল ফল খাইয়া আছি। কলা, চিনাবাদাম, খেজুর জলপাইএর তেল, লেবু ঐরূপ কোনো টক ফল আমার বর্ত্তমান * খোরাক। এই পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছে বলি না। এত বড় পরিবর্ত্তনের ফল জানার পক্ষে ছয় মাস যথেষ্ট নহে। তবু একথা বলিতে পারি, যখন অপর লোকে রোগে ভুগিয়াছেন, তখন আমার স্বাস্থ্য ভালই ছিল। আমার শারীরিক ও মানসিক শক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বে যতটা ভার আমি উঠাইতে পারিতাম, এখন হয়ত তাহা পারিব না; কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেক বেশী সময় অক্লান্তভাবে মেহনত করিতে পারি। মানসিক পরিশ্রম সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। অনেক রোগীকে আমি ফলাহার করার ব্যবস্থা দিয়াছি; ইহাতে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে। এই সব অভিজ্ঞতার কথা 'রোগের' প্রসঙ্গে আলোচনা করিব।

* মহাত্মাজী বর্ত্তমানে ছাগলের দুধ, খেঁজুর প্রভৃতি ফল ব্যবহার করেন—অনুবাদক।

নিজের ও অপরের অভিজ্ঞতা হইতে এটুকু এখানে বলিব যে, ফলই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ খোরাক।

এই অধ্যায় পড়িয়াই যে লোকে ফলাহার করা আরম্ভ করিয়া দিবে, তাহা আমি মনে করি না। এমনও হইতে পারে যে, ইহা পড়িয়া এক জন লোকেরও মত পরিবর্ত্তিত হইবে না। কিন্তু আমি যাহা ভাল বুঝিয়াছি তাহা জানান আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

কিন্তু যদি কেহ আহার্য্যরূপে ফল ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি যেন ব্যস্ত না হইয়া হুঁসিয়ার ভাবে ইহা আরম্ভ করেন। ইহাতে তিনি সুফল লাভ করিবেন। কিছু করার পূর্ব্বে এই পুস্তকের সব অধ্যায় তিনি যেন যত্নের সহিত পড়েন এবং ইহার মূলতত্ত্বগুলি বুঝিতে চেষ্টা করেন। পাঠকদের নিকট আমার অনুরোধ এই যে, আমার সমস্ত কথা জানার পর যেন তাঁহারা নিজেদের মতামত প্রকাশ করেন।

ফলের পর নিরামিষ আহারই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। সব রকম শাক-সবজী, গম, চাল ডাল দুধ প্রভৃতি ইহার ভিতর পড়ে। শাক-সবজী ফলের ন্যায় পুষ্টিকর নহে, কারণ রাঁধিবার সময় তাহার বলকর উপাদান খানিকটা নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু আমরা পাক না করিয়া এ সব জিনিষ খাইতে পারি না; এজন্য এখন দেখিতে হইবে কোন্ উদ্ভিজ্জ খাদ্য আমাদের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শস্যের ভিতর গমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। গমের ভিতর মানুষের শরীর রক্ষার উপযোগী সব রকম পুষ্টিকর উপাদান উপযুক্ত পরিমাণে আছে; এজন্য শুধু গম খাইয়া লোকে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। গম হইতে অনেক প্রকার সহজপাচ্য খাদ্য প্রস্তুত হয়। শিশুদের জন্য যে তৈরী খাদ্য বাজারে বিক্রয় হয় তাহার ভিতরে কিছু গম থাকে।

জোয়ার বাজরা ও মক্কা গমের শ্রেণীভুক্ত হইলেও ইহারা গমের সমান উপকারী নহে। এগুলি দিয়াও রুটি তৈরী হয়। গম কিরূপে খাইলে ভাল হয়, তাহা এখন অলোচনা করিব। আমরা যে সাদা কলের-ময়দা ব্যবহার করি তাহা কোনো কাজের নয়; ইহাতে কোনো পুষ্টিকর পদার্থ নাই। ইংরেজ ডাক্তার এলিনসন বলিয়াছেন, তিনি একটি কুকুরকে শুধু কলের ময়দা খাওয়াইতেন। ফলে কুকুরটি মরিয়া যায়। আর একটি কুকুরকে তিনি আটা খাওয়াইতেন, সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ছিল। কলের ময়দায় খোসা থাকে না; কিন্তু গমের প্রায় সমস্ত পুষ্টিকর অংশ ও স্বাদ এই খোসার ভিতর থাকে। পেট ভরার সাথে সাথে জিহ্বারও তৃপ্তিসাধন করিতে চায় বলিয়া লোকে ময়দার রুটী ব্যবহার করে। শুধু পনির খাইলেই লোকে পুষ্টিলাভ করিতে পারে; কিন্তু তাহারা রুটীর সঙ্গে পনীর খায়। কলের ময়দার রুটি ভাল হয় না; ইহা 'চিমড়ে' হয় এবং ইহাতে স্বাদ বা গুণ কিছুই থাকে না। পরিষ্কার গম হইতে ঘরে জাঁতায় ভাঙা যে আটা হয় তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পেষা আটা না চালিয়াই ব্যবহার করা উচিত। ইহার রুটি নরম ও মিষ্ট। ময়দা অপেক্ষা ইহাতে বেশী দিন চলে, কারণ পুষ্টিকর জিনিষ বেশী থাকায় ইহার খরচ কম হয়।

বাজারের পাঁউরুটি দেখিতে সাদা ও সুন্দর হইলেও কোনো কাজের নয়। ইহাতে কিছু না কিছু ভেজাল থাকেই। ইহার প্রধান দোষ এই যে, ইহা ময়দা পচাইয়া তৈরী করা হয়। অনেকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, এরূপ খাদ্য স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। ইহা তৈরীর সময় উনানের ভিতর চর্ব্বি লাগান হয়; কাজেই ইহা হিন্দু-মুসলমানের বর্জ্জন করা উচিত। বাড়ীতে প্রস্তুত না করিয়া বাজারের রুটি অথবা পাঁউরুটি ব্যবহার করা অলসতার চিহ্ন।

আর একটি সহজ উপায়ে গম ব্যবহার করা যায়। গম মোটা করিয়া ভাঙিয়া পাক করিবে এবং তাহাতে দুধ চিনি মিশাইয়া খাইবে। ইহা সুস্বাদু-ও স্বাস্থ্যকর।

চাউলে সার একরূপ কিছুই নাই। ডাল, ঘি ও দুধের ন্যায় পুষ্টিকর খাদ্য ব্যতীত শুধু ভাত খাইয়া মানুষ জীবিত থাকিতে পারে কিনা সন্দেহ। কিন্তু গম সম্বন্ধে এ কথা খাটে না, কারণ মানুষ শুধু জলে সিদ্ধ করা গম খাইয়া সুস্থ থাকিতে পারে।

প্রধানত মুখরোচক বলিয়াই আমরা শাকসবজী খাই। কোষ্ঠ-পরিষ্কারক বলিয়া ইহাতে রক্তও কিছু পরিষ্কার হয়। ইহারা ঘাসেরই প্রকারভেদ এবং সহজে হজম হয় না। যাঁহারা বেশী শাকসবজী খান, তাঁহারা স্থূলকায় হন; বদহজম হয় বলিয়া তাঁহারা অজীর্ণের ঔষধ ঢুঁড়িয়া বেড়ান। এজন্য শাকসবজী খুব কম ব্যবহার করা উচিত।

মুগ, মুসুর, অড়হর, মটর, ছোলা ও মাসকলাই প্রভৃতি সব ডাল অতিশয় গুরুপাক। এগুলি হজম করা খুব শক্ত—পাকস্থলীতে যথেষ্ট আগুন থাকিলে হজম হইবে। ডাল খাইলে দেরীতে ক্ষুধা লাগে ও বায়ু নিঃসরণ হয়, ইহাতে বুঝা যায় যে, ইহা কম হজম হয়। মজুরদের ন্যায় যাহাদের শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়, ডাল খাইলে তাহাদের উপকার হয়। যাহারা কম পরিশ্রম করেন, তাহারা যেন বেশী ডাল না খান। যাহারা গদীর উপর বসিয়া কাজ করে তাহাদের ও মজুরদের খোরাক এক রকম হইতে পারে না।

হেগ নামক ইংলণ্ডের এক সুবিখ্যাত ডাক্তার বহু পরীক্ষার পর বলিয়াছেন, ডাল খুব অপকারী। ইহা খাইলে আমাদের শরীরের ভিতর এক প্রকার অম্লরস সৃষ্টি হয়। এই অম্লরস নানা রকম রোগ ও অকালবার্দ্ধক্য আনয়ন করে। তাঁহার যুক্তিগুলি এখানে উল্লেখ করার

দরকার নাই। আমার নিজের অভিজ্ঞতাও ঐ মতের পরিপোষক। যাহারা ডাল ছাড়িতে পারেন না বা ছাড়িতে চান না, তাহারা যেন খুব সাবধানে ইহা ব্যবহার করেন।

যে সব উদ্ভিজ্জ খাদ্য বর্জ্জনযোগ্য তাহা এখন আলোচনা করিব। ভারতবর্ষে লঙ্কা, জিরা, গোলমরিচ, ধনিয়া প্রভৃতি মসলার ব্যবহার খুব বেশী। পৃথিবীর আর কোথাও এরূপ নাই। আফ্রিকার হাবশিরাও আমাদের মসলাযুক্ত খাদ্য খাইবে না; তাহাদের নিকট ইহা স্বাদহীন লাগে। আমি নিজেই দেখিয়াছি, মসলা ব্যবহার করিলে গোরাদের পেট খারাপ ও মুখের উপর ব্রণ হয়। বাস্তবিক মসলায় কোনো স্বাদ নাই, কিন্তু অনেক দিনের অভ্যাসের জন্য ইহা আমাদের ভাল লাগে। তবে সেরেফ স্বাদের জন্য কিছু খাইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করা ঠিক নহে।

তবে কেন আমরা এত মসলা ব্যবহার করি? সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বেশী খাইতে পারিব এবং হজমের সাহায্য হইবে ভাবিয়া আমরা মসলা ব্যবহার করি। লঙ্কা, ধনিয়া জিরা ইত্যাদি কৃত্রিম ভাবে খাদ্য হজম করাইয়া কৃত্রিম ক্ষুধার উদ্রেক করে। ইহা হইতে যদি মনে করি যে, ভুক্তদ্রব্য সম্পূর্ণরূপে হজম হইয়াছে এবং রক্তে পরিণত হইয়া শরীরের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, তবে ভুল করা হইবে। যাহারা বেশী মসলা খায় তাহাদের হজমশক্তি কমে; তাহাদের রক্তাল্পতা এবং গ্রহণী পর্য্যন্ত হয়। একটি লোক অতিরিক্ত লঙ্কা খাওয়ার জন্য পূর্ণ যৌবনে মরিয়াছে জানি। সুতরাং খাদ্যের ভিতর মসলা না দেওয়াই ঠিক।

যে কথা মসলা সম্বন্ধে বলা হইল, তাহাই লবণ সম্বন্ধেও খাটে। ইহা কাহারও পছন্দ হইবে না; অনেকে তো ইহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইবেন। কিন্তু ইহা হাতে কলমে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে।

ইংলণ্ডের এক শ্রেণীর লোকের মত এই যে, অধিকাংশ মসলা অপেক্ষা লবণ খারাপ। আমরা যে সব শাকসবজী খাই, তাহার ভিতর যে লবণ থাকে তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট; আমাদের খাদ্যের সহিত আলাদা লবণ মিশানর দরকার নাই। খনি, সমুদ্র প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন লবণ আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক; উহা শরীরের ভিতর গিয়াই ঘাম হইয়া অথবা অন্য উপায়ে বাহির হইয়া আসে, উহা শরীরের কোনো উপকারে লাগে না। একখানা পুস্তকে এ কথা পর্য্যন্ত আছে যে, লবণ ব্যবহারে রক্ত খারাপ হয় এবং যে ব্যক্তি অনেক দিন লবণ ব্যবহার না করিয়া অন্য উপায়ে শরীর সুস্থ রাখে, তাহার রক্ত এত বিশুদ্ধ যে, সাপে কামড়াইলেও তাহার কোনো অনিষ্ট হয় না, কারণ তাহার রক্তে এইরূপ বিষ নষ্ট করার শক্তি আছে। ইহা ঠিক কি না জানি না। কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, কাশি, অর্শ, হাঁপানি, রক্তপ্রবাহ ইত্যাদি ব্যারামে লবণ বন্ধ করিয়া দিলে শীঘ্রই উপকার পাওয়া যায়। এক ব্যক্তির বহুদিন হইতে হাঁপানি ও কাশি ছিল। সে লবণ ত্যাগ করিয়া আরাম হইয়াছে। লবণ ত্যাগ করায় কাহারও কোনো অনিষ্ট হইয়াছে শুনি নাই। আমি তো দুই বৎসরের অধিক লবণ ছাড়িয়া দিয়াছি; ইহাতে কোনো ক্ষতি হয় নাই, বরং উপকারই হইয়াছে। এখন অল্প জল খাইলে চলে। ইহাতে অলসতা কমে। আমার লবণ ছাড়ার কাহিনী একটু বিচিত্র। অপর এক ব্যক্তির কোনো ব্যাধি হইয়াছিল দেখিয়া আমি লবণ ছাড়ি। তাঁহার সেই ব্যারাম পরে বৃদ্ধি পায় নাই—একই ভাবে আছে। আমার বিশ্বাস যদি তিনি সম্পূর্ণভাবে লবণ ছাড়িয়া দিতেন, তবে রোগ নির্ম্মূল হইত।

লবণ ছাড়িতে হইলে তরিতরকারী ও ডাল ছাড়িতে হইবে। বহু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তরিতরকারী একদম ত্যাগ করা সহজ নহে। আমার মনে হয়, লবণ বিনা তরকারী ও ডাল হজম করা কঠিন। লবণ

হজমশক্তি কিছু বৃদ্ধি করে সত্য, কিন্তু ইহার পরিণাম ভাল নহে। লঙ্কা খাইলে যেমন হজমশক্তি বাড়ে মনে হয় এবং পরে ক্ষতি হয়, লবণেও ঠিক তাহাই হয়। এজন্য লবণ ত্যাগ করিলে তরিতরকারী ও ডাল অবশ্য ত্যাগ করিতে হইবে। আফিম ছাড়িলে যেমন কিছুদিন কষ্ট হয় এবং শরীর অসুস্থ মনে হয়, লবণ ছাড়িলেও কিছুদিন শরীর ঐরূপ ঠেকিবে; কিন্তু ধৈর্য্যের সহিত চেষ্টা করিলে পরে উপকার পাওয়া যাইবে।

আমি দুধও ত্যাগ করা উচিত মনে করি। এ বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতাও আছে। সে সব কথা এখানে বলার প্রয়োজন নাই। দুধের উপকারিতা সম্বন্ধে আমাদের এত অধিক ভুল ধারণা আছে যে, তাহা নষ্ট করার চেষ্টা নিরর্থক। আমি মনে করি না যে, পাঠকগণ এই পুস্তকের সব কথাই স্বীকার করিয়া লইবেন। এ আশাও করি না, যাহারা আমার মত পছন্দ করেন, তাহারা চটপট সেই অনুসারে চলা সুরু করিবেন। যাহার যাহা উচিত মনে হয়, তিনি তাহাই করুন। আমার নিজের মত প্রকাশ করা আমি উচিত মনে করিতেছি। অনেক ডাক্তার বলিয়াছেন যে, দুধে কালাজ্বর উৎপন্ন করে। এ সম্বন্ধে অনেক পুস্তিকাও বাহির হইয়াছে। দুধে শীঘ্রই বাতাসের জীবাণু মিশিতে পারে, সুতরাং দুধ হইতে শীঘ্রই স্বাস্থ্যহানিকর জীবাণু উৎপন্ন হয়। ইহা ভিন্ন দুধকে সুরক্ষিত করাও কম ঝঞ্ঝাটের কাজ নহে। দক্ষিণ আফ্রিকায় দুধের কারখানার জন্য নিয়মাবলী বানান হইয়াছে। দুধ কিভাবে জ্বাল দিতে হইবে, কিভাবে রাখিতে হইবে, কিরূপে পাত্র সাফ রাখিতে হইবে, সে সব কথা উহাতে আছে। যে জিনিষের জন্য এত যত্ন-চেষ্টা করা দরকার, আর যত্ন না করিলে যাহাতে অনিষ্ট হয়, সে জিনিষ খাদ্যরূপে ব্যবহার করা উচিত কিনা, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

গরুর খোরাক ও স্বাস্থ্যের উপর দুধ ভাল মন্দ হওয়া নির্ভর করে। ডাক্তারগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, ক্ষয়রোগগ্রস্ত গাভীর দুগ্ধ ব্যবহারে ক্ষয়রোগ জন্মে। বিলকুল সুস্থ গাই পাওয়া কঠিন। গরুর স্বাস্থ্য ভাল না হইলে তাহার দুধ খাইলে রোগ হয়। সকলেই জানেন, মায়ের যে ব্যারাম থাকে, শিশুও স্তন্যপান করিয়া সেই রোগে আক্রান্ত হয়। শিশুর ব্যারাম হইলে, চিকিৎসকগণ মাকে ঔষধ খাওয়ান, কারণ মায়ের দুধের ভিতর শিশু ঔষধ পায়। এই কথা গাইএর দুধ সম্বন্ধেও খাটে। যে গরুর দুধ পান করা হয় তাহার স্বাস্থ্য যেমন, আমাদের স্বাস্থ্যও সেইরূপ হইবে। যে দুধের জন্য এত বিড়ম্বনা এত ঝঞ্ঝাট ভোগ করিতে হয়, তাহা ত্যাগ করা কি ঠিক নহে? দুধের যে বলকারক গুণ আছে, তাহা আরও অনেক জিনিযের আছে। জলপাইএর তেলে দুধের প্রয়োজন অনেকখানি সিদ্ধ হইতে পারে। গরম জলে বাদাম কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিয়া ছিলকা ফেলিয়া দিয়া পিষিয়া জলে গুলিয়া পান করিলে দুধ পান করার ফল পাওয়া যায়।* ইহার সুবিধা এই যে, দুধের অনিষ্টকারিতা ইহাতে বিলকুল নাই।

এখন প্রাকৃতিক নিয়মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহার আলোচনা করা যাক। বাছুর কিছুদিন পর্য্যন্ত দুধ পান করে, পরে ছাড়িয়া দেয়। দাত উঠিলে যাহা দাঁত দিয়া খাওয়া যায়, সেইরূপ জিনিষ খাওয়া আরম্ভ করে। মানুষেরও এইরূপ করা দরকার। আমরা শুধু শৈশবকালেই দুধ খাইব। দাঁত উঠিলে আতা, নাশপাতি প্রভৃতি কাঁচা ফল, বাদাম ইত্যাদি শুকনা ফল এবং রুটি প্রভৃতি খাইব। দুধের নেশা ছুটিলে কত

* মহাত্মাজী দুধের সমান পুষ্টিকর নিরামিষ খাদ্যের অনেক সন্ধান করিয়াছেন। তিনি এখনও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাই বুঝি দুধ খাইতেছেন—অনুবাদক।

সময় ও অর্থ বাঁচে সে আলোচনা করার সময় ইহা নহে। সকলেই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে তাহা স্থির করিতে পারেন। দুগ্ধজাত দ্রব্য ব্যবহারেরও কোনো প্রয়োজন নাই। ঘোল বা মাঠার পরিবর্ত্তে লেবু ব্যবহার করা যাইতে পারে; দুধের অন্যান্য বলকারী উপাদান বাদাম ব্যবহার করিলে পাওয়া যাইবে। হাজার হাজার ভারতবাসী তো ঘির বদলে তেল ব্যবহার করিয়াই থাকে।

এখন তৃতীয় শ্রেণীর খোরাক সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। মাংস ও উদ্ভিদ মিশ্রিত খাদ্যই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। বহু লোকে এরূপ খাদ্য খায়। বাহির হইতে দেখিয়া নীরোগ মনে হইলেও, তাহাদের অনেকে রোগজীর্ণ। মানব দেহের গঠন সাবধানে পরীক্ষা করিলে বুঝা যায় যে, মাংস মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য নহে। মাংস খাইলে আমাদের শরীরের যে অনিষ্ট হয়, তাহা ডাক্তার কিংসফোর্ড ও ডাক্তার হেগ সাহেব স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই বলিয়াছেন, ডাল খাইলে শরীরের ভিতর যেরূপ অম্ল উৎপন্ন হয়, মাংস খাইলেও সেইরূপ অম্ল উৎপন্ন হয়। মাংস খাইলে দাঁত নষ্ট হয়, গিঁটে-বাত হয় এবং রাগও বেশী হয়। ক্রোধী ব্যক্তিকে রোগী বলিতে হইবে; আমাদের স্বাস্থ্যনীতি অনুসারে তাহাকে নীরোগ বলা যায় না।

চতুর্থ বা শেষ শ্রেণীর খাদ্য অর্থাৎ শুধু মাংস যাহারা খান, তাহাদের কথা বলার দরকার নাই। তাহাদের অবস্থা এতই শোচনীয় যে, তাহা আলোচনা করিলে আমরা কখনও মাংস খাওয়ার পক্ষপাতী হইতে পারি না। মাংসাহারীকে কখনও নীরোগ বলা যায় না। মাংসাহারীর ভিতর যাহারা কিছু উন্নত হয় তাহাদের মন উদ্ভিজ্জ খাদ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

মোট কথা এই, যাহারা শুধু ফল খাইয়া জীবন ধারণ করে, এরূপ

লোকের সংখ্যা খুব কম। কিন্তু শুকনা অথবা কাঁচা ফল, গম এবং জলপাইএর তেল ব্যবহার করিয়া মানুষ স্বাস্থ্য স্থির রাখিতে পারে। ফলের ভিতর কলা উত্তম। ইহা ভিন্ন খেঁজুর, আলুবোখারা, ডুমুর, ইত্যাদিও বলকারী। তাজা আঙুর রক্ত সাফ করে। কমলালেবু, সংত্রা, নাশপাতি ও কলা মিশাইয়া রুটির সাথে খাওয়া চলে। রুটি জলপাইতেলে চুবাইয়া লইলে স্বাদ নষ্ট হয় না। এইরূপ খাদ্য প্রস্তুত করিতে হাঙ্গামা ও খরচ কম। ইহার সহিত লবণ, মরিচ, দুধ অথবা চিনি খাওয়ার প্রয়োজন নাই। খালি চিনি খাওয়া অত্যন্ত খারাপ। বহুত মিষ্টি খাইলে দাঁত খারাপ হয়। গম, বাদাম, চিনা বাদাম, আখরোট ও টাটকা ফল হইতে অনেক প্রকার খাদ্য বানান যায়।

—ষষ্ঠ অধ্যায়—

কি পরিমাণ ও কয়বার খাওয়া দরকার

কি পরিমাণ আমাদের খাওয়া উচিত, তাহা লইয়া ডাক্তারদের ভিতর মতভেদ আছে। একজন ডাক্তার বলেন, খুব বেশী খাওয়া দরকার। তিনি গুণানুসারে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের পরিমাণ স্থির করিয়া দিয়াছেন। অপর এক ডাক্তার বলেন, যাহারা শারীরিক পরিশ্রম করে ও যাহারা মানসিক পরিশ্রম করে, তাহাদের খাদ্যের পরিমাণ ও গুণ স্বতন্ত্র হওয়া চাই। তৃতীয় এক ডাক্তার বলেন, মজুর ও বাদশাহের সমান খাদ্য খাওয়া উচিত; গদীয়ানের কম এবং মজুরের বেশী খাদ্যের প্রয়োজন নাই। কিন্তু সকলেই জানেন যে, শক্তিশালী ও দুর্ব্বল লোকের খাদ্যের পরিমাণ ভিন্ন হইবেই। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের খাদ্যের পরিমাণে পার্থক্য আছে, যুবক ও শিশুর এবং যুবক ও বৃদ্ধের খোরাকীর ভিতরও অন্তর থাকিবে। জনৈক লেখক বলিয়াছেন, যদি আমরা খাদ্য এত সুন্দর ভাবে চিবাই যে উহার সমস্ত রস লালার সহিত মিশিতে পারে, তবে পাঁচ হইতে দশ তোলা খাদ্যে আমাদের চলে। তিনি স্বয়ং ইহা হাজার হাজার স্থলে পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তক হাজারে হাজারে বিক্রয় হইয়াছে। লোকে খুব আগ্রহের সহিত তাহা পড়ে। এই সব হইতে বুঝা যায় যে, খাদ্যের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া একদম নিরর্থক।

অধিকাংশ ডাক্তার বলেন যে, শতকরা নিরানব্বই জন লোক জিহ্বার তৃপ্তির জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত খায়। ইহা এত সাধারণ

ব্যাপার যে, ডাক্তাররা না বলিলেও লোকে ইহা সহজেই বুঝিতে পারে। শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে, কি পরিমাণের কম খাওয়া উচিত নয়, তাহা বলা অনাবশ্যক; কারণ খুব কম খাইয়া লোকের শরীর নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বরং খাদ্য কমানর দিকেই আমাদের লক্ষ্য রাখা চাই।

উপরে বলা হইয়াছে খাদ্য খুব ভাল করিয়া চিবান দরকার। ইহাতে খুব অল্প খাদ্য হইতেই অধিক পরিমাণে শরীর রক্ষার উপযোগী পুষ্টিকর উপাদান সংগ্রহ হয়। অভিজ্ঞ লোকে বলেন, যে ব্যক্তি লঘুপাক ও হিতকর খাদ্য গ্রহণ করে, তাহার দাস্ত পরিমাণে অল্প, শক্ত, মসৃণ, দুর্গন্ধরহিত, শুকনা, কাল রং বিশিষ্ট হয়। যাহার মল এরূপ নহে, তাহার বুঝা উচিত যে, সে ভাল করিয়া না চিবাইয়া অনিষ্টকর খাদ্য বেশী পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছে। দাস্ত দেখিয়া লোকে এইরূপে বুঝিতে পারে, সে বেশী খাইয়াছে কি না। রাত্রে যাহার ভাল ঘুম হয় না, যে স্বপ্ন দেখে, প্রাতঃকালে যাহার জিহ্বা অপরিষ্কার মনে হয়, তাহার খাওয়া বেশী হইয়াছে বুঝিতে হইবে। প্রস্রাব করার জন্য রাত্রে উঠিতে হইলে বুঝিবে অতিরিক্ত জলীয় পদার্থ পান করা হইয়াছে। বিশেষ সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে প্রত্যেকে আপনার খাদ্যের পরিমাণ স্থির করিয়া লইতে পারে। অনেকের প্রশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত থাকে, ইহাতে বুঝা যায়, তাহাদের খাদ্য হজম হয় নাই। অতিরিক্ত ভোজন করিলে প্রায়ই খোসপাঁচড়া হয়, নাক ও মুখের উপর ব্রণ হয়। অনেকের পেটবেদনা হয়, কাহারও বা বায়ু নিঃসরণ হয়। আমরা এই সব উপদ্রবকে আমল দি না। এসব অসুখের কারণ কি? কারণ এই যে, আমাদের পেট পায়খানায় পরিণত হয়, আর আমরা এই পায়খানা সঙ্গে করিয়া লইয়া বেড়াই। এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিলে আমাদের নিজেদের উপর ঘৃণা না হইয়া পারে না। কখনও বেশী খাওয়া উচিত নয়। আত্মীয়তা অথবা ভালবাসার খাতিরে খাওয়া অথবা

খাওয়ান বেশ। কিন্তু তাহার রকম এমন হওয়া উচিত, যাহাতে আমরা সুখী হই এবং অভ্যাগতকেও সুখী করিতে পারি। নিমন্ত্রণ, ভোজ প্রভৃতির কথা আমাদের ভুলিয়া যাওয়া উচিত—এজন্য শপথ গ্রহণ করা উচিত। দাঁতন করিতে তো কাহারও নিমন্ত্রণ করি না, জল পান করার সময়ও তো কাহাকেও ডাকি না, তবে খাওয়ার জন্য দেশশুদ্ধ তোলপাড় করি কেন? খাওয়াটাও তো দাতন করার ন্যায় শারীরিক কাজ। ঘরে কোনো অতিথি আসিলে তাহার ও আমাদের উভয়ের দুর্ভাগ্য উপস্থিত। কেন এমন হয়? খাওয়ার লোভে আমরা জিহ্বা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। এজন্য খাওয়ার উপলক্ষ্য খুঁজিয়া বেড়াই। অতিথিকে খুব খাওয়াইয়া তার বাড়ীতে খুব খাওয়ার আশা রাখি। আমরা খুব মিঠাই উড়াইবার সুবিধা খুঁজি এবং পাই। বহুত ঠুসিয়া খাওয়ার পর যদি আমরা কোনো সুস্থ লোককে আমাদের মুখ শুঁকিতে বলি এবং তার কথা শুনি, তবে নিশ্চয়ই আমাদের লজ্জা হইবে। এমন লোভী লোকও আছে, যাহারা খাওয়ার পর ফ্রুট সল্ট খাইয়া অথবা ভুক্তদ্রব্য বমি করিয়া আবার খাওয়ার জন্য বসিয়া যায়।

আমরা সকলেই অল্পবিস্তর এইরূপ; এজন্য মহাপুরুষগণ আমাদের জন্য ব্রত, উপবাস রোজা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যেও বহু উপবাসের ব্যবস্থা আছে। কেবল শরীর সুস্থ রাখার জন্য যদি কোনো ব্যক্তি প্রতি পক্ষে একদিন সম্পূর্ণ উপবাস করে অথবা একবার খায়, তবে ইহাতে কোনো ক্ষতি হয় না, বরং উপকারই হয়। অনেক হিন্দু চাতুর্মাস্য ব্রত করে অর্থাৎ চারি মাস পর্য্যন্ত দিনে একবার মাত্র ভোজন করে। ইহার ভিতরই সুখে থাকার রহস্য নিহিত আছে। বর্ষাকালে যখন হাওয়া শীতল থাকে ও সূর্য্য প্রায়ই দেখা যায় না, তখন পাকাশয়ের শক্তি কম হয়। এ সময় লোকের কম খাওয়া উচিত।

কতবার খাওয়া উচিত তাহা এখন আলোচনা করিব। ভারতবর্ষে অসংখ্য লোকে দুইবার খায়। মজুরেরা তিনবারও খাইয়া থাকে। ইংরেজী ঔষধ এদেশে আমদানী হইবার পর চারিবার খাওয়ার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের কতকগুলি নূতন প্রতিষ্ঠিত সমিতি প্রচার করিতেছে, দিনে দুইবারের বেশী খাওয়ার দরকার নাই। তাহারা বলেন, প্রাতঃকালে কিছু ভোজন করা অনাবশ্যক। রাত্রের ঘুম খোরাকীর প্রয়োজন সিদ্ধ করে। এজন্য প্রাতঃকালে খাওয়ার জন্য ব্যস্ত না হইয়া, কাজের জন্য ব্যস্ত হওয়া উচিত। এই সব সমিতির মত এই যে, এক প্রহর কাজ করার পর খাইবে। এই মতাবলম্বী লোকে দিনে দুইবার খান এবং মধ্যে চা ইত্যাদিও পান করেন না। এই বিষয়ে ডিওয়ে নামক বহুত অভিজ্ঞ এক ডাক্তার একখানি পুস্তক লিখিয়া উপবাস করা, প্রাতর্ভোজন না করা, এবং ফল খাওয়ার উপকারিতার কথা অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন। নিজের আট বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে কহিতেছি, যুবাবস্থা পার হইলে কাহারও দুইবারের বেশী খাওয়ার দরকার নাই। যখন মানুষের শরীরের গঠন সম্পূর্ণ হইতে থাকে অথবা হইয়া যায় তখন তাহার বেশী বার অথবা অধিক পরিমাণে খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই।

—সপ্তম অধ্যায়—

ব্যায়াম

হাওয়া, জল ও খাদ্যের ন্যায় ব্যায়ামও মানুষের বিশেষ দরকার। অবশ্য ব্যায়াম না করিয়া মানুষ অনেক বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে; কিন্তু হাওয়া জল ও খাদ্য বিনা এরূপ পারে না। ব্যায়াম ভিন্ন লোকে নীরোগ থাকিতে পারে না, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ব্যায়াম অর্থে আমি শুধু টেনিস, ফুটবল, ক্রিকেট, হকি এবং হাটা বুঝি না; শারীরিক ও মানসিক কাজ মাত্রই ব্যায়াম। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য খাদ্যের ন্যায় ব্যায়াম অবশ্য প্রয়োজনীয়। শারীরিক ব্যায়াম না করিলে শরীর দুর্ব্বল হয় এবং মানসিক ব্যায়াম না করিলে মনও দুর্ব্বল হয়। মূর্খতাকেও এক প্রকার রোগ মনে করা উচিত। কোনো বিখ্যাত পালোয়ান কুস্তি লড়িতে প্রবীণ হইলেও যদি তাহার মন অনুন্নত থাকে তবে তাহাকে নীরোগ বলা ভুল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যাহার শরীর ও মন দুইই সুস্থ, তাহাকেই প্রকৃত স্বাস্থ্যবান বলা চলে।

শরীর ও মন সমানভাবে সুস্থ রাখিতে পারে এমন ব্যায়াম আছে কি? বাস্তবিক প্রকৃতি এরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছে যে, আমরা একই সময় শারীরিক ও মানসিক কাজে নিযুক্ত হইতে পারি। শান্তভাবে চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, দুনিয়ার অধিকাংশ লোক চাষবাস করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কৃষকের পরিবারের সকলকেই খুব ব্যায়াম করিতে হয়। রোজ ৮।১০ ঘণ্টা অথবা তাহা অপেক্ষা বেশী কাজ করিলে তাহাদের খাওয়া-পরা জোটে। মানসিক উন্নতির জন্য ইহাদের

কোনো স্বতন্ত্র ব্যায়াম করিতে হয় না। কৃষক মূর্খ হইলে তাহার দ্বারা কোনো কাজ চলে না। তাহাকে মাটি চিনিতে হয়, চাষের কাল সম্বন্ধেও তাহার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বুদ্ধিপূর্ব্বক চাষ করার যোগ্যতা এবং চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রের গতির জ্ঞান তাহার থাকা চাই। শহরের বড় বড় বুদ্ধিমানকেও এ বিষয়ে কৃষকের নিকট হার মানিতে হইবে। কৃষক বলিতে পারে কোন বীজ কিরূপে বপন করিতে হয়। তার আশেপাশের রাস্তাঘাট লোকজন সে চেনে। তারা ইত্যাদি দেখিয়াও সে রাত্রে দিক নির্ণয় করিতে পারে। পাখীর ডাক শুনিয়া ও গতি দেখিয়া সে অনেক বিষয় জানিয়া লয়। পক্ষী বিশেষ একত্র হইয়া কলরব করা সুরু করিলে সে বুঝিতে পারে বর্ষা হইবে না অন্য কিছু হইবে। নিজের কাজের জন্য সে খগোল ভূগোল ও ভূ-বিদ্যা কিছু জানে। নিজের সন্তানদের ভরণপোষণ তাহাকে করিতে হয়, এজন্য মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সাধারণ জ্ঞান তাহার হয়। অনন্ত আকাশের নীচে থাকে বলিয়া সে ঈশ্বরের মহত্ত্ব সহজে বুঝে। তাহার শরীর মজবুত হয়। নিজের ঔষধ সে নিজে বানাইয়া লয়। মানসিক শিক্ষার জন্য কৃষক যাহা করে তাহা বলা হইল।

পরন্তু সকলে কৃষক হইতে পারে না, আর এই অধ্যায় কৃষকদের জন্য লেখাও হয় নাই। এখন প্রশ্ন এই, যাহারা ব্যবসায় অথবা অন্য উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করে, তাহারা কি করিবে? লোকে যাহাতে নিজেদের চালচলন কৃষকদের মত করে, সে জন্য কৃষকদের জীবনযাপন প্রণালীর বর্ণনা এখানে করিলাম। কৃষকদের চালচলন হইতে আমাদের চালচলন যত স্বতন্ত্র হইবে, আমরা তত অধিক রুগ্ন হইব। কৃষকদের জীবন হইতে পাঠক বুঝিয়াছেন যে, মানুষের আট ঘণ্টা শারীরিক শ্রম করা দরকার এবং তাহা এরূপ হওয়া চাই যে, তাহার সহিত মানসিক শ্রম করার অবসর পাওয়া যায়।

যাহাদের বসিয়া বসিয়া সময় কাটাইতে হয়, এরূপ ব্যবসায়ী অথবা ঐ শ্রেণীর লোকের কিছু মানসিক পরিশ্রম করিতে হয় সত্য, কিন্তু তাহা একই ধরণের এবং এত অল্প যে তাহাকে ব্যায়াম বলাই যায় না। কৃষকদের ন্যায় ইহাদের খগোল, ভূগোল, ও ইতিহাসের জ্ঞান নাই। ইহারা জিনিষপত্রের দাম ও মালবিক্রীর কৌশল খুব জানে, কিন্তু এই সব কাজে মানসিক শক্তির পূর্ণ ব্যবহার হয় না এবং কিছু শারীরিক পরিশ্রম হইলেও ইহার পরিমাণ অতি কম।

এইরূপ লোকের জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন বার্ষিক উৎসব বা পর্ব্বাদির সময়ও বিশেষ বিশেষ খেলার বন্দোবস্ত আছে। তাঁহারা মানসিক শ্রমের জন্য এমন পুস্তক পড়িতে বলিয়াছেন, যাহাতে বেশী চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না। ইহা এক পক্ষের কথা। এরূপ খেলায় যে শারীরিক ব্যায়াম হয়, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা দ্বারা লোকের কোনো মানসিক উন্নতি হয় না। ইহার অনেক উদাহরণ আছে। ক্রিকেট ও ফুটবল খেলায় যাহারা ওস্তাদ, তাহাদের ভিতর কত জন ভাল মানসিক শক্তিবিশিষ্ট? ভারতের যে সব রাজা-মহারাজা ভাল খেলোয়াড়, তাঁহারা যে খুব বেশী মানসিক শক্তিবিশিষ্ট তাহার কি প্রমাণ আছে? যাঁহাদের মানসিক শক্তি খুব বেশী, তাঁহাদের ভিতর কয়জনেই বা ভাল খেলোয়াড়? আমার মনে হয়, যাহারা বেশী মানসিক শক্তিবিশিষ্ট, তাহাদের ভিতর কম লোকেই ভাল খেলিতে পারে। বিলাতের লোকে আজকাল খুব খেলা করে; কিন্তু তাহাদের কবি কিপলিং খেলোয়াড়দের মানসিক শক্তির খুব নিন্দা করিয়াছেন।

ভারতের বুদ্ধিমান লোকেরা ভিন্ন পথে চলেন। তাঁহারা মানসিক শ্রম করেন, কিন্তু শারীরিক শ্রম মোটেই করেন না, অথবা কম করেন।

এজন্য তাঁহাদিগকে আমরা অসময়ে হারাই; বরাবর মানসিক কাজ করার ফলে তাঁহাদের শরীর ক্ষীণ হইয়া যায়। কোনো না কোনো রোগ তাঁহাদের শরীরে বাসা বাঁধে এবং তাঁহাদের অভিজ্ঞতা যখন দেশের কাজে লাগার উপযুক্ত হয়, তখন তাঁহারা শরীর ত্যাগ করেন। ইহা হইতে মনে হয়, কেবল শারীরিক ও কেবল মানসিক ব্যায়াম যথেষ্ট নহে, এবং যাহা শুধু খেলোয়াড়ের উপযোগী, তাহাও উপযুক্ত ব্যায়াম নহে। যে ব্যায়াম দ্বারা মন ও শরীর উভয়ের উন্নতি হয়, সেই ব্যায়ামই ভাল এবং ইহা দ্বারা লোকে নীরোগ থাকিতে পারে। কেবল মাত্র কৃষকেরাই এই শ্রেণীর ব্যায়াম করিয়া থাকে।

যাহারা কৃষক নহে তাহারা কি করিবে? ক্রিকেট প্রভৃতি ব্যায়াম ঠিক নহে। এজন্য আমাদের এরূপ ব্যায়াম খুঁজিয়া বাহির করা চাই, যাহা দ্বারা কৃষকের মত শরীর ও মন দুইএরই উপকার হয়। ব্যবসায়ী অথবা অন্য লোকে বাড়ীর আশেপাশে ফুলবাগান করিয়া তাহাতে প্রত্যহ দুই চারি ঘণ্টা মাটী খোঁড়া ইত্যাদি কাজ করিতে পারে। ফেরিওয়ালাদের নিজের কাজে ঘুরিতে গিয়াই ব্যায়াম হয়। 'আমরা অপর লোকের বাড়ীতে থাকিলে, তার জমিতে কেন কাজ করিব?' এরূপ প্রশ্ন করা মনের সঙ্কীর্ণতা মাত্র। জমি যার হউক না কেন, চাষ করিলে এবং ফসল উৎপন্ন করিলে কিছু লাভ তো হইবেই। আর একজনের জমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলাম বলিয়াও তো আমাদের আনন্দ হইবে।

যাহাদের ইহা করার সুবিধা নাই, অথবা যাহারা ইহা পছন্দ করিবে না, তাহাদের জন্য কিছু লেখা দরকার। ক্ষেতের কাজের পরেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যায়াম ভ্রমণ। আমাদের দেশে সাধু ফকিরেরা খুব সুস্থ; ইহার একটি কারণ এই যে, তাঁহারা ঘোড়া, গাড়ী প্রভৃতির ব্যবহার না করিয়া পায়ে হাটিয়া সর্ব্বত্র চলাফেরা করেন। থরো নামে

এক প্রসিদ্ধ আমেরিকান ভ্রমণ সম্বন্ধে এক সুচিন্তিত পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহাতে আছে, যে লোক সময় অভাবের অজুহাতে ঘরের বাহির হয় না, চলাফেরা করে না, আর সর্ব্বদা লেখাপড়া করে, তাহার লেখাও তাহার ন্যায় নিস্তেজ, প্রাণহীন। নিজের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, 'আমি যখন বেশী বেশী ভ্রমণ করিতাম, তখন ভাল ভাল বই লিখিয়াছি।' তিনি রোজ চার পাঁচ ঘণ্টা হাটিতেন। খুব ক্ষুধা থাকিলে যেমন আমরা কোনো কাজ করিতে সক্ষম হই না, শুধু খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হই; ঐরূপ আমাদের ব্যায়ামের জন্য এমন আগ্রহ থাকা চাই যে, ইহা না করিলে আমরা অপর কোনো কাজ করিতে সক্ষম না হই। নিজেদের মানসিক কাজের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা আমরা পছন্দ করি না; এজন্য আমরা বুঝিতে পারি না, শারীরিক শ্রম বিনা মানসিক শ্রম কত নীরস ও প্রাণহীন। ভ্রমণে শরীরের প্রত্যেক অংশে রক্ত দ্রুত সঞ্চালিত হয় এবং শরীর শক্ত হয়। চলার সময় হাত পা সঞ্চালন তো হয়ই, সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ হাওয়া সেবন করা হয়। সুন্দর দৃশ্য দেখিয়াও আনন্দ লাভ হয়। সর্ব্বদা একই স্থান অথবা গলি দিয়া হাটা ঠিক নহে; মাঠে এবং বনের মধ্যে ঘোরাও প্রয়োজন। ইহাতে প্রাকৃতিক শোভার সহিত পরিচয় হইবে। দুই এক মাইল হাটা হাটাই নহে, দশ বার মাইল হাঁটাই প্রকৃত হাটা। যে প্রত্যহ ইহা করিতে না পারে, সে প্রতি রবিবার খুব হাটিতে পারে।

একটি অজীর্ণ রোগী কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট ঔষধ আনিতে গিয়াছিল। চিকিৎসক তাহাকে রোজ অল্প হাটিতে পরামর্শ দিলেন। রোগী বলিল, তাহার মোটেই হাটার শক্তি নাই। চিকিৎসক বুঝিলেন, রোগীর সাহস কম। তিনি রোগীকে নিজের গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। রাস্তায় তিনি ইচ্ছা করিয়া চাবুক ফেলিয়া

দিলেন। ভদ্রতার খাতিরে রোগী চাবুক আনার জন্য নীচে নামিল। এদিকে চিকিৎসক গাড়ী হাকাইয়া দিলেন। রোগী হাঁপাইতে হাঁপাইতে গাড়ীর পিছনে অনেক দূর ছুটিল। খানিক পরে চিকিৎসক গাড়ী ফিরাইয়া রোগীকে উঠাইয়া লইলেন এবং বলিলেন, "হাটাই ছিল তোমার পক্ষে ঔষধ সদৃশ; তোমার হাটার জন্য আমি এই নির্দ্দয় ব্যবহার করিলাম।" পরিশ্রমের জন্য রোগীর খুব ক্ষুধা লাগিয়াছিল, সে চাবুকের কথা ভুলিয়া গেল। সে বুঝিল, কবিরাজের ব্যবহারে তাহার লাভ হইয়াছে এবং বাড়ী গিয়া তৃপ্তির সহিত ভোজন করিল। যাঁহারা বদহজম অথবা বদহজম হইতে উৎপন্ন কোনো রোগে ভুগিতেছেন, তাঁহারা ভ্রমণরূপ ব্যায়াম পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

—অষ্টম অধ্যায়—

পোষাক

আহারের ন্যায় পোষাকের উপরেও স্বাস্থ্য কতকটা নির্ভর করে। মেম-সাহেবরা কল্পিত সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য এমন পোষাক পরেন, যাহাতে তাঁহাদের কোমর ও পা ছোট থাকে*। এজন্য তাঁহাদের অনেক প্রকার ব্যাধিতে ভুগিতে হয়। চীন দেশের মহিলারা পা এত ছোট করেন যে, আমাদের দেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পাও তাঁহাদের পা অপেক্ষা বড়। ফলে সেখানকার নারীদের স্বাস্থ্য বিশেষরূপে খারাপ হয়। পোষাক-পরিচ্ছদ নির্ব্বাচনে আমাদের প্রায়ই কোনো হাত নাই। আমাদের বড়রা যে পোষাক ব্যবহার করেন, আমাদের তাহাই ব্যবহার করিতে হয়; আর বর্ত্তমানে এরূপ করার দরকারও আছে। পোষাকের মুখ্য উদ্দেশ্য ভুলিয়া, আমরা পোষাক হইতে এখন লোকের ধর্ম্ম, দেশ ও জাতি নির্ণয় করি। ইহা ভিন্ন কুলী, মজুর, ধনী, শিক্ষক ও ব্যবসায়ীর পোযাক ভিন্ন ভিন্ন ধরণের। এ অবস্থায় স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতে পোষাকের আলোচনা করা বড় কঠিন; তথাপি এ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। 'পোষাক' অর্থে এখানে জুতা অলঙ্কার প্রভৃতিও বুঝিতে হইবে।

পোষাকের মুখ্য উদ্দেশ্য কি? স্বাভাবিক (আদিম) অবস্থায় মানুষ কাপড় পরিত না; স্ত্রীপুরুষ সকলেই শুধু নিজেদের গুপ্ত অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিত, শরীরের বাকী অংশ খোলা রাখিত। ইহাতে তাহাদের চামড়া

* তাঁহারা সে কু অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছেন—অনুবাদক।

কঠিন ও মজবুত হইত। তাহারা রৌদ্র, জল, বাতাস খুব সহ্য করিতে পারিত এবং তাহাদের হঠাৎ সর্দ্দি ইত্যাদি হইত না। হাওয়ার অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, আমরা শুধু নাক দিয়া হাওয়া লই না; চামড়ার অসংখ্য ছিদ্রপথেও আমাদের শরীরে হাওয়া প্রবেশ করে। কাপড় পরিয়া আমরা চামড়ার এই মহৎ কাজে বাধা দিতেছি। শীতপ্রধান দেশের লোক অলস হইয়া পড়িলে, তাহাদের শরীর ঢাকার প্রয়োজন হয়। ঠাণ্ডা সহিতে না পারায় পরে পোষাক পরার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। শেষে পোষাক অলঙ্কার রূপে গণ্য হয়। তাহার পর ইহা দেশ, জাতি প্রভৃতির পরিচায়ক হইয়া উঠিয়াছে।

প্রকৃতি মানুষকে উপযুক্ত চামড়ার পোষাকে সাজাইয়া দিয়াছে। উলঙ্গ অবস্থায় শরীর খারাপ দেখায়, ইহা ভুল ধারণা। নগ্ন অবস্থার চিত্রই তো লোকের সর্ব্বোত্তম চিত্র। পোষাক দ্বারা শরীর ঢাকিয়া আমরা বুঝাই, আমরা যেন প্রকৃতির কাজের দোষ বাহির করিয়া তাহা গোপন করার চেষ্টা করিতেছি। পয়সাবৃদ্ধির সহিত আমরা সাজগোজ বাড়াইতে থাকি। আমরা নানারূপে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে ব্যস্ত। আয়নায় মুখ দেখিয়া কত জনে ভাবে, 'বা! আমার চেহারা কেমন সুন্দর!' এইরূপ অভ্যাসের ফলে আমাদের দৃষ্টি যদি খারাপ না হইত, তবে আমরা বুঝিতে পারিতাম যে, মানুষের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য নগ্ন দশায়; আর এইরূপে স্বাস্থ্যও অটুট থাকে। শুধু কাপড়-চোপড় পরিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া নরনারী গহনা পরা সুরু করিয়াছে। অনেক পুরুষও পায়ে 'কড়া', কানে মাকড়ী ও হাতে আংটি পরে। এই সব জিনিষ আবর্জ্জনার আধার। ইহা পরিলে কিরূপে সৌন্দর্য্য ফাটিয়া পড়ে তাহা বুঝা খুব শক্ত। এ বিষয়ে স্ত্রীলোকেরা চূড়ান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা এত ভারি মল ব্যবহার করেন যে, পা উঠান কঠিন হয়; কানে

কর্ণফুল ও মাকড়ি, নাকে নথ, গলায় হার, হাতে চুড়ি প্রভৃতি যতই গহনা হউক না কেন, কিছুতেই তাহাদের আশা মিটে না। এই সব অলঙ্কার পরিলে শরীরে খুব ময়লা জমে; নাকে ও কাণে যে কত ময়লা জমে তাহার সীমা নাই। এই নোংরামীকে আমরা সৌন্দর্য্য মনে করি এবং ইহার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া চোর ডাকাতের হাতে খুন জখম হইতেও ভয় পাই না। এ কথা সত্য যে, অভিমানজাত মূর্খতার জন্য আমরা অনেক পয়সা খরচ করি। কাণে ঘা হইলেও অনেক স্ত্রীলোক মাকড়ি খুলিতে দেয় না, হাত ফুলিয়া উঠিলেও বালা বাহির করিতে দিবে না; আঙ্গুল পাকে পাকুক তবু নর-নারী হাত হইতে আংটি খুলিতে দিবে না—ইহাতে যে সৌন্দর্য্য হানি হইবে! এরূপ দৃশ্য অনেক দেখা যায়।

পোষাকের আমূল সংস্কার সহজ নহে, তবে আমরা অলঙ্কার ও অনাবশ্যক কাপড়চোপড় একদম বিদায় দিতে পারি। প্রচলিত রীতি অনুসারে কিছু কাপড় রাখিয়া অতিরিক্ত পোষাক ত্যাগ করিতে পারি। যিনি পোষাক পরিচ্ছদকে অলঙ্কার মনে করেন না, তিনি এ বিষয়ে অনেক পরিবর্ত্তন আনিয়া বেশ সুস্থ থাকিতে পারেন।

আজকাল একটা ধূয়া উঠিয়াছে যে, সাহেবী* পোষাক পরা ভাল; ইহাতে লোকে আমাদের সম্মান ও আদর করিবে। এ কথা বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করার স্থান ইহা নহে। য়ুরোপীয় পোষাক শীতপ্রধান দেশের উপযোগী হইলেও ভারতের পক্ষে মোটেই উপযোগী নহে। ভারতের হিন্দু-মুসলমানের পক্ষে ভারতীয় পোষাকই প্রশস্ত। আমাদের পোষাক খোলা আর ঢিলা ধরণের; এ জন্য ইহার ভিতর হাওয়া যাতায়াত করিতে পারে। ইহা সাদা বলিয়া ইহার উপর সূর্য্যকিরণ

* সে স্রোত অনেক দিন হইতে ফিরিয়াছে—অনুবাদক।

পড়িয়া ছড়াইয়া যায় এজন্য ইহা বেশী গরম হয় না। কাল পোষাকের উপর সূর্য্য কিরণ পড়িলে তাহা ছড়াইয়া যায় না বলিয়া গরম হয়।

আমরা প্রায়ই মাথা ঢাকিয়া রাখি। বাড়ীর বাহিরে যাইতে হইলে নিশ্চয়ই ঢাকি। পাগড়ী বাঁধার অভ্যাস আমাদের মধ্যে খুব প্রচলিত। যথাসম্ভব মাথা খুলিয়া রাখিলে উপকার হয়। চুল বড় রাখা আর সিতি কাটা অসভ্যতার লক্ষণ। লম্বা চুলে ধূলা, ময়লা ও উকুন জমিতে পারে; মাথায় ফোড়া হইলে তাহার চিকিৎসা করা মুস্কিল হইয়া পড়ে। যাঁহারা পাগড়ী বাঁধে তাহাদের মাথায় বেশী চুল হইতে দেওয়া বেওকুফী।

আমরা পায়ের দ্বারাও অনেক রোগ ডাকিয়া আনি। যাহারা বুট পরে তাহাদের পা অতি নরম হইয়া যায়। তাহা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ ঘাম বাহির হয়। যাহাদের ঘ্রাণশক্তি প্রবল, তাহারা বুট অথবা মোজা খোলার সময় পাশে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। জুতাকে 'পদত্রাণ' ও 'কাঁটার শত্রু' বলা হয়। যখন কাঁটার ভিতর দিয়া চলিতে হয়, কিংবা রোদে হাটিতে হয়, বা ঠাণ্ডায় বাহির হইতে হয় তখন জুতা পরিলেই চলে। জুতা দ্বারা যেন সমস্ত পা ঢাকা না থাকে, শুধু তলা ঢাকিলেই যথেষ্ট। এ উদ্দেশ্য 'খড়ম-জুতা' বা 'স্যাণ্ড্যাল' দ্বারাই সাধিত হয়। যাঁহারা জুতা ব্যবহার করেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও মাথাধরা, পায়ে ব্যথা ও শারীরিক দুর্ব্বলতা থাকিলে, তাঁহারা যেন খালি পায়ে হাটা অভ্যাস করেন। তাঁহারা শীঘ্রই বুঝিতে পারিবেন যে, খালি পায়ে থাকিলে, মাটির উপর খালি পায়ে হাটিলে, পায়ে ঘাম জমিতে না দিলে, শরীরের কত উপকার হয়।

—নবম অধ্যায়—

গোপন কথা

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহা যাঁহারা যত্নের সহিত পড়িয়াছেন তাঁহাদের আমি বিশেষ অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন এই অধ্যায়টি আরও বেশী মনোযোগের সহিত পড়েন এবং এ বিষয়টি ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখেন। আরও কতকগুলি দরকারী অধ্যায় অবশ্য লেখা হইবে। কিন্তু তাহাদের কোনোটি এত প্রয়োজনীয় নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ পুস্তকে এমন একটি বিষয়ও নাই যাহা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত নহে, অথবা যাহা আমি সত্য মনে করি না।

স্বাস্থ্যরক্ষার নানা উপায় আছে। ইহার প্রত্যেকটি বিশেষ প্রয়োজনীয়; কিন্তু সকলের চেয়ে বেশী দরকারী ব্রহ্মচর্য্য। বিশুদ্ধ বায়ু, নির্ম্মল জল এবং পুষ্টিকর খাদ্যই স্বাস্থ্যরক্ষার সাহায্য করে। কিন্তু যে শক্তি আমরা সঞ্চয় করি তাহা ব্যয় করিয়া ফেলিলে, আমরা কিরূপে সুস্থ থাকিব? যে অর্থ আমরা উপার্জ্জন করি তাহা খরচ করিয়া ফেলিলে আমরা কিরূপে দরিদ্র না হইয়া পারি? খাঁটি ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিলে, নর-নারী কখনও বলবান হইতে পারে না।

ব্রহ্মচর্য্য কি? ইহার অর্থ এই, নর-নারী পরস্পর সম্বন্ধে কাম-চিন্তা হইতে বিরত থাকিবে। তাহারা কামচিন্তার সহিত পরস্পরকে স্পর্শ করিবে না, স্বপ্নেও এরূপ চিন্তাকে মনে স্থান দিবে না। তাহাদের পরস্পরের দৃষ্টি সর্ব্বপ্রকার কাম-গন্ধহীন হইবে। যে গুপ্ত-শক্তি ভগবান আমাদের দিয়াছেন তাহা কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা দ্বারা রক্ষা করিয়া

কেবলমাত্র শারীরিক নহে, মানসিক ও আত্মিক উদ্যম ও শক্তি বর্দ্ধিত করিতে হইবে।

কিন্তু চারিপাশে আমরা কি দৃশ্য দেখিয়া থাকি? নর-নারী যুবক-বৃদ্ধ ইন্দ্রিয়-সেবায় নিরত। কামান্ধ হইয়া তাহারা ন্যায়-অন্যায় বিচার-শক্তি হারায়। দেখিয়াছি ইহার মারাত্মক প্রভাবে পড়িয়া বালক-বালিকারা পর্য্যন্ত পাগলের ন্যায় ব্যবহার করে। ঠিক এইরূপ প্রভাবে পড়িয়া আমিও এরূপ করিয়াছি, ইহার অন্যথা হইবার উপায়ও ছিল না। যে জীবনী-শক্তি আমরা কঠিন পরিশ্রম সহকারে সঞ্চয় করি, ক্ষণিক সুখের জন্য তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে বিসর্জ্জন দিয়া থাকি। মোহ দূর হইলে, আমাদের অবস্থা শোচনীয় হয়। পরদিন প্রাতঃকালে আমরা ভয়ানক দুর্ব্বলতা এবং ক্লান্তি অনুভব করি, এবং মন কোনো কাজ করিতে চায় না। ক্ষতিপূরণ করিবার আশায় আমরা প্রচুর পরিমাণ দুগ্ধ মোদক প্রভৃতি সেবন করি, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য দূর করিবার জন্য সব রকম টনিক খাই এবং শরীরের ক্ষয়পূরণ করিবার ও ইন্দ্রিয়-শক্তিলাভের জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হই। এরূপে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায়। ক্রমে আমরা বৃদ্ধ হই—তখন আমাদের শরীর ও মনের শক্তি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায়।

কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম ঠিক ইহার বিপরীত। আমরা যত বৃদ্ধ হইব, আমাদের বুদ্ধি তত তীক্ষ্ণ হইবে—যত দীর্ঘ দিন আমরা বাঁচিব, আমাদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফল অন্য লোকের উপকারে লাগানর শক্তি তত বাড়িবে। যাঁহারা খাঁটি ব্রহ্মচারী তাঁহাদের পক্ষে একথা নিশ্চয়ই খাটে। মৃত্যুভয় তাঁহাদের নাই, এবং মৃত্যুকালেও তাঁহারা ভগবানকে ভুলেন না। তাঁহারা মিথ্যা আশা লইয়া মত্ত থাকেন না। তাঁহারা হাসিতে হাসিতে মৃত্যুর সম্মুখীন হন এবং শেষদিনের জন্য বীরের ন্যায় অপেক্ষা

করেন। ইঁহারা খাঁটি মানুষ, শুধু ইঁহাদের সম্বন্ধে একথা বলা চলে যে, ইঁহারা স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়াছেন।

আমরা কদাচিৎ ভাবিয়া দেখি যে, অসংযমই জগতের অধিকাংশ দম্ভ, রাগ, ভয় এবং হিংসার মূল। আমাদের মন যদি আমাদের বশে না থাকে, যদি প্রত্যেক দিন এক অথবা একাধিক বার আমরা ছোট শিশুর অপেক্ষা মূর্খের ন্যায় ব্যবহার করি, তবে জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে কোন্ পাপ আমরা না করিতে পারি? আমাদের কাজ যতই খারাপ ও পাপপূর্ণ হউক না কেন, তাহার ফল সম্বন্ধে কিরূপে আমরা চিন্তা না করিয়া পারি?

কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে, 'এরূপ খাঁটি ব্রহ্মচারী কে কবে কোথায় দেখেছে? যদি সব লোক ব্রহ্মচারী হয়, তবে কি মানব-জাতি লোপ পেয়ে সমগ্র জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে না?' ধর্ম্মের দিকটা বাদ দিয়া শুধু পার্থিব দিক দিয়া এই প্রশ্ন আলোচনা করিব। আমার মনে হয়, এরূপ প্রশ্ন শুধু আমাদের ভীরুতার পরিচয় দেয়। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে যে ইচ্ছা-শক্তির দরকার, তাহা আমাদের নাই, সেজন্য আমরা ওজর আপত্তি দেখাই। খাঁটি ব্রহ্মচারী সম্প্রদায় লুপ্ত হইয়া যায় নাই। কিন্তু যদি তাঁহাদিগকে যখন-তখন দেখা যাইত, তবে ব্রহ্মচর্য্যের কি মূল্য থাকিত? হাজার হাজার শ্রমিক পৃথিবীর অভ্যন্তরে গভীর গর্ত্ত করিয়া স্তূপ স্তূপ পাহাড় কাটিয়া একটু হীরক খুঁজিয়া বাহির করে। ইহা অপেক্ষা অনেক গুণ মূল্যবান ব্রহ্মচর্য্য পালন করার জন্য কত বেশী পরিশ্রম করা উচিত! ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে গেলে জগৎ লুপ্ত হইয়া যাইবে, এরূপ চিন্তা আমাদের না করাই ঠিক। আমরা কি ভগবান যে, আমরা জগতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এত চিন্তিত হইব? যিনি ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই ইহা রক্ষা করিবেন। অন্য লোকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে কি না, তাহা

লইয়া মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। যখন আমরা কোনো কারবার অথবা কাজ করিতে সুরু করি, তখন কি আমরা ভাবিয়া থাকি, যদি সকলেই ইহা করে, তবে পৃথিবীর অবস্থা কি হইবে? খাঁটি ব্রহ্মচারী শেষ পর্য্যন্ত এরূপ প্রশ্নের উত্তর নিজেই পাইবেন।

কিন্তু যাহারা পার্থিব চিন্তায় বিব্রত, তাহারা এই আদর্শ কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিবে? বিবাহিতেরা কি করিবে? যাহাদের সন্তান-সন্তুতি আছে তাহারা কি করিবে? যাহারা আপনাদিগকে সংযত রাখিতে পারে না, তাহারা কি করিবে? পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, এক শ্রেষ্ঠ আদর্শে আমাদের পৌঁছিতে হইবে। এই আদর্শ সর্ব্বদা চোখের সামনে রাখিয়া সেখানে পৌঁছানর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। শিশুদিগকে বর্ণমালা শিক্ষা দিবার সময় আমরা তাহাদের সম্পূর্ণ অক্ষরই দেখাই, এবং তাহারা যথাসাধ্য ঐ অক্ষর লিখিতে চেষ্টা করে। এইরূপে আদর্শ ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, দৃঢ়তার সহিত কাজ করিয়া গেলে আমরা পরিশেষে সফলকাম হইতে পারি। বিবাহিত জীবন হইলেই বা ক্ষতি কি? প্রকৃতির নিয়ম এই, যখন স্বামী-স্ত্রী সন্তান লাভের ইচ্ছা করিবে, তখন ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ করা চলে। ইহা মনে রাখিয়া যাঁহারা চার পাঁচ বৎসরের ভিতর একদিন ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম লঙ্ঘন করেন, তাহারা কামের দাস নহেন; তাঁহারা সঞ্চিত জীবনী-শক্তির বেশী কিছু হারাইবেন না। কিন্তু হায়! শুধু সন্তানলাভের জন্য সহবাস করেন এরূপ স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা কত কম! অধিকাংশ লোকে কামপ্রপীড়িত হইয়াই ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করে—ফলে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাহাদের সন্তান জন্মে। ইন্দ্রিয়সুখে পাগল হইয়া আমাদের কাজের পরিণাম সম্বন্ধে আমরা কিছু ভাবি না। এ বিষয়ে নারী অপেক্ষা পুরুষজাতি অধিক দোষী। পুরুষ এত কামান্ধ যে, স্ত্রীর

শরীর দুর্ব্বল কি না, সে গর্ভধারণ করিতে এবং সন্তান পালন করিতে সক্ষম কি না, সে চিন্তা সে কখনও করে না। পাশ্চাত্যদেশে লোকে সকল সীমা অতিক্রম করিয়াছে। তাহারা ইন্দ্রিয়সেবা করে, কিন্তু পিতা-মাতার দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইবার জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে। এই বিষয়ে অনেক বই লেখা হইয়াছে এবং সন্তান নিরোধ করার জন্য নিয়মিতভাবে ব্যবসায় চলিতেছে। আমরা এখনও এই পাপ হইতে মুক্ত; কিন্তু নারীর উপর মাতৃত্বের বোঝা চাপাইতে সঙ্কোচবোধ করি না এবং একবার এ-চিন্তাও করি না যে, আমাদের শিশুগণ শক্তি-সামর্থহীন। সন্তান জন্মিলে প্রত্যেকবার আমরা ভগবানকে ধন্যবাদ দি এবং এইরূপে আমাদের পাপ ঢাকিতে চেষ্টা করি। দুর্ব্বল, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, বিকলাঙ্গ এবং ভীরু সন্তান লাভ করিয়া নিজদিগকে ভগবানের ক্রোধের পাত্র মনে করা কি উচিত নয়? বালক বালিকার সন্তান হওয়া কি আনন্দের বিষয়? ইহা কি বরং একপ্রকার অভিশাপ নহে? কোনো চারাগাছে ফল হইলে গাছ দুর্ব্বল হয়, এজন্য যাহাতে ফল বিলম্বে হয়, তাহার জন্য সকল চেষ্টাই আমরা করি। কিন্তু বালক বালিকা সন্তানের পিতামাতা হইলে, আমরা ভগবানের প্রশংসাগীতি গাহি। ইহা অপেক্ষা বেশী ভয়ানক কি কিছু হইতে পারে? আমরা কি মনে করি, ভারতে এবং অন্যত্র এরূপ অসংখ্য শিশু বাড়িতে থাকিলে জগতে মুক্তি আসিবে? এ বিষয়ে আমরা ইতর প্রাণী অপেক্ষা অনেক হীন, কারণ তাহারা শুধু সন্তান উৎপত্তির জন্য সহবাস করে। গর্ভধারণের সময় হইতে শিশুর দুগ্ধত্যাগের সময় পর্য্যন্ত নর-নারীর পৃথক থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রাণঘাতী আমোদ প্রমোদে মাতিয়া আমরা এই মহান্ কর্ত্তব্যের কথা ভুলিয়া যাই। এই দুরারোগ্য ব্যাধি আমাদের মনকে দুর্ব্বল করে এবং অল্পদিনের মধ্যে আমাদের দুঃখময় জীবনের অবসান হয়। বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি,

বিবাহিত লোকে তাহা যেন বুঝেন এবং সন্তানলাভের ইচ্ছা না হইলে যেন ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ না করেন।

কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় এ পথে চলা বড় শক্ত। আমাদের খাদ্য, জীবনযাপন প্রণালী, কথাবার্ত্তা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এমন যে, ইহার প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়দিগকে উত্তেজিত করে। ইন্দ্রিয়পরায়ণতা বিষের ন্যায় আমাদের জীবনীশক্তি নষ্ট করিতেছে। এই দাসত্ব হইতে আমাদের মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাকে কেহ কেহ অবিশ্বাস করিতে পারেন। যাঁহারা এইরূপ সন্দেহ করেন, তাঁহাদের জন্য এই বই লেখা হয় নাই; যাঁহারা ইহা লাভের জন্য আগ্রহান্বিত এবং আত্মোন্নতির জন্য সচেষ্ট, এ বই তাঁহাদের জন্য। যাঁহারা আমাদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট আছেন, তাঁহারা ইহা পড়াও কষ্টকর মনে করিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা নিজেদের শোচনীয় অবস্থা বুঝিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের কাজে লাগিবে।

যে-কিছু বলা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, যাঁহারা এখনও অবিবাহিত আছেন, তাঁহারা যেন অবিবাহিত থাকিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু যদি তাঁহারা বিবাহ না করিয়া থাকিতে পারেন না, তবে যতদূর সম্ভব দেরী করিয়া যেন বিবাহ করেন। যুবকেরা যেন প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁহারা ২৫।৩০ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিবেন। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে শারীরিক উপকার ভিন্ন অন্যান্য যে সব উপকার পাওয়া যায়, সে কথা এখানে আলোচনা করিব না।

যে সব অভিভাবক এই অধ্যায় পড়িবেন, তাঁহাদের নিকট আমার অনুরোধ, অল্প বয়সে বিবাহ দিয়া তাঁহারা যেন তাঁহাদের শিশু পুত্রদের গলায় পাষাণ বাঁধিয়া না দেন। নিজেদের বৃথা অভিমান চরিতার্থের পরিবর্ত্তে তাঁহারা যেন তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়দের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। তাঁহারা যেন বংশগৌরব অথবা সম্মান

সম্বন্ধে সব রকম ভ্রান্ত ধারণা হইতে মুক্ত হন এবং এরূপ হৃদয়হীন প্রথার স্রোতে গা ভাসাইয়া না দেন। যদি তাঁহারা সন্তানসন্ততির প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী হন, তবে তাঁহারা যেন তাহাদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখেন। যখন তাহারা শিশুমাত্র, তখন তাহাদের বিবাহ দিয়া এবং জীবনের গুরু দায়িত্ব ও ভাবনা-চিন্তা তাহাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া, অভিভাবকগণ আপন আপন সন্তান-সন্ততির ভীষণ অনিষ্ট করেন।

প্রকৃত স্বাস্থ্যনীতি অনুসারে বিপত্নীক এবং বিধবার পুনর্বিবাহ করা ঠিক নহে। যুবক যুবতীর জীবনীশক্তি মাঝে মাঝে নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত কিনা, এসম্বন্ধে ডাক্তারদের মতভেদ আছে: কেহ কেহ বলেন ইহা উচিত, কেহ কেহ বলেন অনুচিত।* ডাক্তারদের ভিতর যখন এই মতভেদ, তখন ডাক্তাররা সমর্থন করেন ভাবিয়া, আমরা যেন বেপরোয়াভাবে ইন্দ্রিয়সেবা না করি। নিজের এবং অন্যের অভিজ্ঞতা হইতে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য সহবাস কেবল-মাত্র অনাবশ্যক নহে, বরং ইহা বিশেষ অনিষ্টকর। যে শারীরিক ও মানসিক শক্তি আমরা অনেকক্ষণ ধরিয়া সঞ্চয় করি, বীর্য্যের একবারমাত্র অপব্যবহারে তাহা মুহূর্ত্তেই নষ্ট হয়। এই প্রনষ্ট জীবনী-শক্তি উদ্ধার করিতে অনেক সময় আবশ্যক হয়, এবং একথা বলাও চলে না যে, ইহা সম্পূর্ণভাবে পুনরুদ্ধার করা যায়। ভাঙা আয়না মেরামত করিয়া কাজ চালান যায়, কিন্তু ইহা ভাঙা আয়না ভিন্ন আর কিছুই নহে।

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, বিশুদ্ধ বায়ু, নির্ম্মল জল, স্বাস্থ্যকর খাদ্য এবং পবিত্র চিন্তা ভিন্ন জীবনী-শক্তি রক্ষা করা অসম্ভব। স্বাস্থ্য ও নীতি-ধর্ম্মের সম্বন্ধ এরূপ ঘনিষ্ঠ যে, পবিত্র জীবন যাপন না করিলে, আমরা সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারি না। অতীতের-ভুল ত্রুটির কথা ভুলিয়া, যে

ব্যক্তি নিষ্ঠার সহিত পবিত্র জীবন-যাপন করিতে চেষ্টা করিবে, সে অচিরে ইহার ফল পাইবে। যাঁহারা অল্প সময়ের জন্যও ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তাঁহারাও দেখিবেন, তাঁহাদের শরীর ও মনের শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে এবং কোনোমতে তাঁহারা এই সম্পত্তি ত্যাগ করিতে রাজী হইবেন না। ব্রহ্মচর্য্যের মূল্য পূর্ণভাবে বুঝিয়াও, আমি ইহা ভঙ্গ করিয়াছি এবং এজন্য যথেষ্ট ভুগিয়াছি। এই পতনের আগের এবং পরের অবস্থার কথা তুলনা করিতে গেলে, আমি লজ্জা ও অনুতাপে মরিয়া যাই। কিন্তু অতীতের ভুল হইতে আমি এই সম্পত্তি অটুটভাবে রক্ষা করিতে শিখিয়াছি; এবং পূর্ণ বিশ্বাস করি, ভগবানের করুণায় ভবিষ্যতে আমি ইহা রক্ষা করিতে পারিব, কারণ আমি নিজে ব্রহ্মচর্য্যের অমূল্য ফলের স্বাদ পাইয়াছি। বাল্যকালে আমার বিবাহ হইয়াছিল এবং অল্প বয়সেই আমি সন্তানের পিতা হইয়াছিলাম। পরে আমার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া দেখিলাম, মানবজীবনের মূল নিয়ম সম্বন্ধে আমি কত অজ্ঞ। যদি অন্ততঃ পক্ষে একজন পাঠকও আমার পতন এবং অভিজ্ঞতার কথা জানিয়া হুঁসিয়ার ও লাভবান হন, তবে এই অধ্যায় লেখা সার্থক হইয়াছে মনে করিব। অনেক আমাকে বলিয়াছেন, এবং আমিও ইহা বিশ্বাস করি যে, আমার যথেষ্ট উৎসাহ ও শক্তি আছে এবং আমার মন কোনোরূপে দুর্ব্বল নহে। কেহ কেহ বলেন, আমার শক্তি এত বেশী যে, আমাকে একগুঁয়ে বলাও চলে; তথাপি অতীতের কার্য্যের ফলস্বরূপ আমার মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতা আছে। অবশ্য বন্ধুদের তুলনায় আমি নিজেকে সুস্থ ও বলবান বলিতে পারি। বিশ বৎসর ইন্দ্রিয়সেবার পরও, আমি যখন এ অবস্থায় পৌঁছিতে পারিয়াছি, তখন ঐ বিশ বৎসরও যদি পবিত্র থাকিতে পারিতাম, তবে আমার অবস্থা আরও কত ভাল হইত! আমার এ বিশ্বাস পুরোপুরি আছে,

যদি সারাজীবন অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে পারিতাম, তবে আমার উৎসাহ ও শক্তি হাজার গুণ বেশী হইত এবং আমি সেই শক্তি প্রয়োগ করিয়া নিজের ও দেশের কাজ করিতাম। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে গিয়া, আমার ন্যায় অসম্পূর্ণ ব্রহ্মচারী যদি এত উপকার পাইয়া থাকে, তবে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালনের ফলে যে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক-শক্তি লাভ হইবে, তাহা কত বিস্ময়জনক!

ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম যখন এত কঠিন, তখন যাহারা অবৈধভাবে ইন্দ্রিয়সেবা করে, তাহাদিগকে কি বলিব? ব্যভিচার এবং বেশ্যাবৃত্তি হইতে উদ্ভূত পাপ, ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রের একটি কঠিন সমস্যা। স্বাস্থ্যনীতি-গ্রন্থে ইহা পূর্ণভাবে আলোচিত হইতে পারে না। এখানে এইটুকু দেখাইব, যাহারা এ-সব পাপে লিপ্ত, তাহাদের ভিতর সহস্র সহস্র লোকে কুৎসিৎ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। এই হিসাবে ভগবান দয়ালু যে, তিনি পাপীকে শীঘ্রই শাস্তি দেন। এইসব লোকের জীবন হাতুড়ে চিকিৎসকের শোচনীয় দাসত্বের ভিতর থাকিয়া শীঘ্রই শেষ হয়—তাহারা বৃথা তাহাদের ব্যাধির ঔষধ খুঁজিয়া বেড়ায়। ব্যভিচার ও বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ হইলে বর্ত্তমানে যত ডাক্তার আছে, অন্ততঃ পক্ষে তার অর্দ্ধেকের কাজ থাকিবে না। এই সব কুৎসিৎ ব্যাধি মানুষকে এমনভাবে পাইয়া বসিয়াছে যে, চিন্তাশীল চিকিৎসকগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, যতদিন ব্যভিচার ও বেশ্যাবৃত্তি থাকিবে, ব্যাধিনিরাময়ের ঔষধ আবিষ্কার হওয়া সত্ত্বে, ততদিন মানবজাতির কোনো আশা নাই। এইসব ব্যাধির ঔষধ এত বিষাক্ত যে, সাময়িক উপকার করিলেও তাহারা মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে, এবং এই সব রোগ বংশপরম্পরায় সংক্রামিত হইয়া থাকে।

কিরূপে বিবাহিত লোকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে তাহা সংক্ষেপে

বলিতেছি। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শুধু বাতাস, জল ও খাদ্য-সম্বন্ধে নিয়ম পালন করিলেই হইবে না। স্ত্রীর সহিত স্বামী গোপনে সাক্ষাৎ করিবে না। সামান্য চিন্তা করিলেই বুঝা যায়, স্বামী-স্ত্রীর গোপনে থাকার উদ্দেশ্যই ইন্দ্রিয়সেবা। রাত্রে তাহারা পৃথক পৃথক কুঠরীতে থাকিবে এবং দিনের বেলায় সর্ব্বদা ভাল কাজে ব্যাপৃত থাকিবে। তাহারা এমন সব বই পড়িবে, যাহাতে তাহাদের মন উচ্চ চিন্তায় পূর্ণ হয়। তাঁহারা বড় বড় লোকের জীবনী আলোচনা করিবে এবং একথা সব-সময় মনে রাখিবে যে, ইন্দ্রিয়সেবা বহু দুঃখের মূল কারণ। কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার ইচ্ছা হইলেই শীতল জলে স্নান করিবে, ইহাতে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা কমিয়া যাইবে এবং সৎকাজ করার শক্তি বাড়িবে। একাজ করা শক্ত; কিন্তু অসুবিধার সহিত লড়াই করিয়া জয়লাভ করার জন্যই আমাদের জন্ম হইয়াছে। এইরূপ করিবার সঙ্কল্প যাহার নাই, সে কখনও প্রকৃত স্বাস্থ্য-সুখ লাভ করিতে পারে না।

দ্বিতীয় খণ্ড

কতকগুলি সরল চিকিৎসা

—প্রথম অধ্যায়—

বায়ু-চিকিৎসা

স্বাস্থ্যের মূলতত্ত্ব ও তাহা রক্ষার উপায় সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। যদি সকলে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম মানিতেন এবং স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন, তবে যে সব অধ্যায় এখন লেখা হইবে, তাহা লেখার দরকার মোটেই হইত না; কারণ এরূপ নর-নারী কখনও শারীরিক ও মানসিক ব্যাধিতে কষ্ট পান না। কিন্তু এরূপ স্ত্রী-পুরুষ কদাচিত দেখা যায়। যাঁহাদের কখনও কোনো প্রকার ব্যাধি হয় নাই, এরূপ লোক বিরল। সাধারণ লোকের তো অসুখ লাগিয়াই আছে। তাহারা পূর্ব্ব-বর্ণিত নিয়মগুলি যত অধিক পালন করিবে, তত অধিক নীরোগ হইবে। যাহাতে রোগ হওয়া মাত্র লোকে না ঘাবড়ায় এবং ডাক্তার-কবিরাজের বাড়ী ছুটাছুটি না করিয়া নিজেরাই রোগ দূর করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই পরের অধ্যায়গুলি লেখা হইল।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিশুদ্ধ হাওয়া যেরূপ একান্ত প্রয়োজনীয়, রোগ দূর করার জন্যও ইহা সেইরূপ প্রয়োজনীয়। কোনো বাতের রোগীকে গরম হাওয়ার ভাপ দিলে সে খুব ঘামিবে এবং তাহার

সন্ধিস্থলগুলি ঢিলা হইয়া যাইবে। এইরূপ ভাপ-চিকিৎসাকে "টার্কিশ বাথ" বলে।

প্রবল জ্বরে যাহার শরীর আগুনের মত গরম হইয়াছে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ করিয়া খোলা হাওয়ায় শোওয়াইলে, তাহার দেহের তাপ একদম কমিয়া যাইবে এবং জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হইবে। শরীর ঠাণ্ডা হইলে, গায়ে চাদর মুড়িয়া দিলে ঘাম ছুটিয়া জ্বর ত্যাগ পাইবে। আমরা কিন্তু ইহার উল্টাই করি। রোগী মুক্ত বাতাসে থাকিতে ইচ্ছা করিলেও, সে গরমে কষ্ট পাইলেও এবং জ্বর বৃদ্ধি হইলেও, আমরা তাহার ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দি, তাহার মাথা ও নাক পর্য্যন্ত খোলা রাখিতে দি না। ফলে রোগী ঘাবড়াইয়া যায় ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যদি অত্যধিক গরমের জন্য জ্বর হইয়া থাকে, তবে উপরে বর্ণিত হাওয়া-চিকিৎসায় কোনো ক্ষতি করিবে না, ইহার উপকারিতা তৎক্ষণাৎ বুঝা যাইবে। অবশ্য দেখিতে হইবে, রোগী খোলা গায়ে থাকিয়া শীতে কষ্ট না পায় ও না কাঁপে। রোগী যদি ঠাণ্ডা বোধ করে, তবে বুঝিতে হইবে তাহার আর কোনো কষ্ট নাই। খোলা গায়ে থাকিতে না পারিলে, তাহার শরীর কম্বল দিয়া ঢাকিয়া দিবে।

পুরাতন জ্বর এবং অন্যান্য রোগে হাওয়া পরিবর্ত্তনে মহা উপকার হয়। অসুখের জন্য হাওয়া পরিবর্ত্তন করা হইয়া থাকে—ইহা হাওয়া-চিকিৎসার প্রকার বিশেষ। যে বাড়ী হইতে রোগ দূর হইতে চায় না, তাহাতে ভূত-প্রেত বাস করে ভাবিয়া লোকে কখনও কখনও বাড়ী পরিবর্ত্তন করে। ভূত-প্রেত থাকে এরূপ মনে করা বিষম ভুল—অবশ্য বাড়ীর খারাপ হওয়াকেই ভূতপ্রেত বলা যাইতে পারে। বাড়ী বদলাইলেই হাওয়া বদলান হয়। ইহাতে খুব উপকার হয়। আমাদের শরীরের সহিত হাওয়ার এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, তাহার সামান্য তারতম্য

হইলেই, আমাদের শরীরের উপর তাহার ভালমন্দ প্রভাব না পড়িয়া যায় না। পয়সাওয়ালা লোকে হাওয়া বদল করার জন্য দূরদেশে যাইতে পারে। গরীব লোকে গ্রামান্তরে বা অপর বাড়ীতে গেলেও লাভবান হইবে। রোগীকে এক ঘর হইতে অন্য ঘরে লইয়া গেলেও লাভ হয়। বাড়ী ঘর এবং গ্রাম বদলের সময় লক্ষ্য রাখা উচিত, যেখানে যাওয়া হইবে সেখানকার হাওয়া যেন খুব ভাল হয়। ঠাণ্ডা হাওয়ার জন্য উৎপন্ন রোগ, আরও বেশী ঠাণ্ডা হাওয়াযুক্ত স্থানে গেলে সারিবে না। এ সব বিষয় পূর্ব্বেই বিবেচনা না করিলে, হাওয়া পরিবর্ত্তনেও ভাল ফল পাওয়া যায় না। কোনো কোনো সময় ভাল হাওয়ায় গিয়াও উপকার হয় না দেখা যায়; স্বাস্থ্য-রক্ষার অন্যান্য নিয়মের প্রতি লক্ষ্য না রাখাই ইহার কারণ।

এই অধ্যায়ে রোগ-চিকিৎসার জন্য হাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু বলা হইল। প্রথম খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে হাওয়া সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে এবং হাওয়ার সহিত স্বাস্থ্যের কি সম্বন্ধ তাহা দেখান হইয়াছে। পাঠকদিগকে এই দুটি অধ্যায় একত্রে পড়িতে অনুরোধ করি; ইহাতে এই অধ্যায় বুঝা সহজ হইবে।

—দ্বিতীয় অধ্যায়—

জল-চিকিৎসা

হাওয়া দেখা যায় না বলিয়া, আমরা ইহার রোগ আরোগ্য করার শক্তি ভালভাবে বুঝিতে পারি না। কিন্তু জলের কাজ ও আরোগ্য করার শক্তি আমরা দেখিতে পাই, এ জন্য তাহার কার্য্যকলাপ খুব শীঘ্র বুঝিতে পারি।

বাষ্প-চিকিৎসার কথা সকলেই অল্প বিস্তর জানেন। জ্বরের সময় আমরা প্রায়ই ইহার প্রয়োগ করি; বেশী মাথা ধরিলে 'ভাপ' দিলে সারিয়া যায়। গিঁটে বাতে বাষ্পস্নানের পর ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে খুব সুফল পাওয়া যায়। শরীরে বেশী ঘা কোড়া হইলে, মলম পুলটিসে কাজ চলে না; কিন্তু শুধু ভাপ দিলে সারিয়া যায়। খুব ক্লান্তির পর বাষ্প স্নান অথবা গরম জলে স্নান করিয়া, তখনই ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে, শরীর হালকা হইয়া যায়, ক্লান্তি দূর হয়। ঘুম না আসিলে বাষ্প-স্নানের পর ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া খোলা হাওয়ায় শুইলে শীঘ্রই ঘুম আসিবে।

বাষ্পের পরিবর্ত্তে গরম জল ব্যবহার করা চলে। পেটে খুব ব্যথা হইলে, ফুটন্ত জল বোতলে পুরিয়া, পেটের উপর মোটা কাপড় রাখিয়া সেঁক দিলে শীঘ্র আরাম হয়। বমি করার দরকার হইলে, খুব গরম জল পান করিলে বমি হইতে পারে। যাহাদের কোষ্ঠবদ্ধ আছে, তাহারা যদি শুইবার সময় অথবা প্রাতঃকালে দাঁতন করার পরে, গরম জল পান করে, তবে তাহাদের কোষ্ঠবদ্ধ দূর হইবার সম্ভাবনা আছে। স্নায়ু

গর্ডন স্প্রিং-এর শরীর খুব ভাল ছিল। কাহারও প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি শুইবার সময় ও ভোরে উঠিয়া প্রত্যহ এক গেলাস গরম জল খাই। এজন্য আমার স্বাস্থ্য এত ভাল।" কত লোকের চা খাওয়ার পর পায়খানা হয়। তাহারা ভুলক্রমে ভাবে ইহা চা-পানের ফল; কিন্তু বাস্তবিক চায়ের ভিতরকার গরমজলই তাহাদের কোষ্ঠ পরিষ্কার করে—চা-পানে তো ক্ষতিই হয়।

বাষ্প-স্নানের জন্য এক প্রকার খাট ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তাহা না হইলেও চলে। একখানি বেতের চেয়ারের নীচে স্পিরিট বা কেরাসিনের ষ্টোভ কিংবা কাঠ বা কয়লার আগুনের একটি ছোট পাত্র রাখিতে হইবে। একটি ছোট পাত্রে জল ভরিয়া তাহার মুখ ঢাকিয়া আগুনের ঠিক উপরে রাখিতে হইবে। চেয়ারের উপর একখানা চাদর বা কম্বল এমন ভাবে রাখিবে যে, তাহা আগুনের দিকে ঝুলিয়া পড়ে এবং রোগীর গায়ে আগুন অথবা বাষ্পের আঁচ না লাগে। চেয়ারের উপর রোগীকে বসাইয়া তাহার চারিদিকে কম্বল অথবা চাদর জড়াইয়া দিবে। জলের উপরের ঢাকনিটা সরাইয়া দিবে—দেখিবে যেন রোগীর গায়ে বাষ্প লাগে। আমরা সাধারণত রোগীর মাথা ঢাকিয়া দি; কিন্তু তাহা করার দরকার নাই। বাষ্পের উত্তাপ শরীরের ভিতর দিয়া মাথা পর্য্যন্ত পৌঁছে এবং তাহাতে মুখের উপর প্রচুর পরিমাণে ঘাম জমিতে থাকে। কিন্তু রোগী যদি এত দুর্ব্বল হয় যে, উঠিয়া বসিতে না পারে, তবে তাহাকে দড়ির অথবা লোহার খাটে শোয়াইয়া বাষ্পস্নান করাইবে। কম্বল এমন ভাবে রাখিতে হইবে যে, উত্তাপ ও বাষ্প বাহিরে না যায়। বাষ্পস্নানের সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে, কম্বল ইত্যাদিতে আগুন না লাগে, আর রোগীর গা না পুড়িয়া যায়। রোগী খুব দুর্ব্বল হইলে খুব বিবেচনা করিয়া বাষ্পস্নান করাইবে; কারণ ইহাতে

যেমন উপকার হয়, তেমনি অপকারও হয়। বাষ্পস্নানের পর মানুষ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু এই দুর্ব্বলতা বেশী দিন থাকে না। প্রত্যহ বাষ্পস্নান করিলে শরীর দুর্ব্বল হইয়া যায়। এজন্য খুব সাবধানে বাষ্পস্নান করিবে। শরীরের যে কোনো অংশে বাষ্প লাগান যায়। কাহারও শীরঃপীড়া হইলে সমস্ত শরীরে ভাপ লাগান দরকার নাই। ছোট মুখওয়ালা পাত্রে জল ফুটাইয়া তার উপর শুধু মাথা রাখিবে। মাথার উপরের অংশ কাপড় দিয়া ঢাকিয়া শুধু নাক দিয়া বাষ্প টানিবে। বাষ্প নাক দিয়া মাথায় উঠিবে। নাক বন্ধ হইয়া গেলেও এইরূপে বাষ্প টানিলে নাক পরিষ্কার হইবে। শরীরের কোনো অংশে ব্যথা হইলে বা ফুলিলে তাহা দূর করার জন্য সেই স্থানে ভাপ দেওয়া দরকার।

গরম জল ও বাষ্পের প্রয়োজনীয়তা সাধারণত সকলে বুঝে, কিন্তু ঠাণ্ডা জলের উপকারিতার কথা খুব কম লোকে জানে। ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই যে, ঠাণ্ডা জলে যত উপকার হয়, গরম জলে তাহা হয় না। ঠাণ্ডা জলে বলবৃদ্ধি করে। অতি দুর্ব্বল লোককেও ঠাণ্ডা জলের সাহায্যে চিকিৎসা করা যায়। জ্বর, বসন্ত, এবং চর্ম্মরোগে ঠাণ্ডাজলে ভিজান চাদর গায়ে জড়াইয়া দিলে অদ্ভুত ফল পাওয়া যায়। কোনো বিপদের আশঙ্কা না করিয়া প্রত্যেকেই ইহা ব্যবহার করিতে পারে। বরফজলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া মাথার চারিপাশে বাঁধিয়া দিলে, তৎক্ষণাৎ মাথাঘোরা এবং প্রলাপ বকা দূর হয়। কোষ্ঠবদ্ধে পেটে বরফ-জলে ভিজান ন্যাকড়া বাঁধিলে দাস্ত খোলসা হইবে। তলপেটে ঠাণ্ডা জলে ভিজান কাপড় বাঁধিয়া শুইলে স্বপ্নদোষও দূর হইতে পারে। শরীরের কোনো স্থান হইতে রক্ত পড়িতে থাকিলে, বরফজলে ভিজান পট্টী বাঁধিলে রক্ত পড়া বন্ধ হইবে। নাক দিয়া রক্ত পড়িতে থাকিলে, মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালিলে রক্ত বন্ধ হয়। নাসারোগ, সর্দ্দি অথবা

শিরঃপীড়া থাকিলে প্রত্যহ দুইবার নাক দিয়া জল টানিলে খুব উপকার হয়। এক নাক দিয়া জল টানিয়া অপর নাক দিয়া বাহির করিবে, অথবা দুই নাক দিয়া টানিয়া মুখ দিয়া বাহির করিয়া দিবে। নাক পরিষ্কার থাকিলে, নাক দিয়া টানা জল পেটে গেলেও কোনো অনিষ্ট হইবে না। ইহাই নাক পরিষ্কার রাখার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। যাহারা নাক দিয়া জল টানিতে পারে না, পিচকারী দিয়াও তাহাদের নাকে জল দেওয়া যায়। দুই চারিবার চেষ্টা করিলে সকলেই নাক দিয়া জল টানা শিখিতে পারে। প্রত্যেকের ইহা জানা দরকার; কারণ ইহাতে মাথা ধরা, নাকের ময়লা ও দুর্গন্ধ দূর করে।

অনেকেই মলদ্বারে পিচকারী দিয়া পেট পরিস্কার করিতে ভয় পান। তাঁহারা বলেন, ইহাতে শরীর দুর্ব্বল হয়; কিন্তু এ ধারণা ভুল। মলদ্বারে পিচকারী দিয়া জল দিলে যত শীঘ্র দাস্ত হয়, এত শীঘ্র ও সহজে আর কোনো উপায়ে হয় না। অনেক ব্যারামে আর কিছুতে উপকার না হইলেও, এই উপায়ে হয়। এই চিকিৎসায় পেট সম্পূর্ণরূপে সাফ হইয়া যায় এবং শরীরে নূতন বিষ জন্মিতে পারে না। যাহারা বাত, বদহজম এবং পেটের গণ্ডগোলে পেট বেদনায় কষ্ট পান, তাহারা পিচকারীর সাহায্যে এক সের জল দিয়া পেট পরিষ্কার করিলে ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারিবেন। এ সম্বন্ধে এক ব্যক্তি একখানা পুস্তক লিখিয়াছেন। অনেক ঔষধ ব্যবহার করিয়াও তিনি অজীর্ণ হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন না। তাঁহার শরীর দুর্ব্বল ও ফ্যাকাশে হইয়া যায়। পিচকারী ব্যবহারে তাঁহার ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে শরীর সম্পূর্ণরূপে ভাল হইয়া যায়। কামলা রোগও এইপ্রকারে শীঘ্র আরোগ্য হয়। ঘন ঘন পিচকারীর প্রয়োগ করিতে হইলে, ঠাণ্ডা জল ব্যবহার করা উচিত। গরম জল বেশী ব্যবহার করিলে শরীর দুর্ব্বল হইতে পারে।

অনেক পরীক্ষার পর জার্ম্মান ডাক্তার কুনো বলিয়াছেন, সকল রোগেই জল চিকিৎসা সর্ব্বোত্তম। এ সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত পুস্তক এত জনপ্রিয় যে, প্রায় সব ভাষায় তাহার অনুবাদ হইয়াছে। ভারতীয় ভাষাতেও এ পুস্তকের অনুবাদ হইয়াছে। কুনের মতে, সকল রোগের মূল পাকাশয়। পেট গরম হইলে জ্বর, বাত, ফোঁড়া, চুলকাণি ইত্যাদি দেখা দেয়। জলচিকিৎসায় যে উপকার হয়, তাহা কেহ কেহ কুনের পূর্ব্বেই জানিতেন। কুনের পুস্তক প্রকাশ হইবার অনেক পূর্ব্বেই 'জলচিকিৎসা' নামক একখানি পুস্তক বাহির হইয়াছিল। কিন্তু কুনের পূর্ব্বে কেহই জোর দিয়া বলেন নাই যে, সকল রোগের মূলই এক, এবং পাকাশয়ই সেই মূল। তাঁহার মত যে সর্ব্বাংশে সত্য তাহা বলিতেছি না; কিন্তু তাঁহার মতে চিকিৎসা করিয়া অনেক লোকের উপকার হইয়াছে। একটা ঘটনা আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দরবনের ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার ট্রিটন বাতে পঙ্গু হইয়াছিলেন; বহু ডাক্তারের চিকিৎসায় তিনি কোনো উপকার পান নাই। এক ব্যক্তির পরামর্শে তিনি কুনের নিকট যাইয়া তাঁহার ব্যবস্থা মত চিকিৎসা আরম্ভ করেন। তিনি সুস্থ ও সবল হইয়া উঠেন। অনেকদিন পর্য্যন্ত তিনি দরবনে সুখে ছিলেন। তিনি লোকদের সর্ব্বদা কুনের মতে চিকিৎসা করিতে বলিতেন। কুনের প্রণালীতে চিকিৎসা করার জন্য নেটালে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। এরূপ আরও প্রতিষ্ঠান অন্যত্র আছে।

ডাক্তার কুনে লিখিয়াছেন, ঠাণ্ডা জলে তলপেটের গরম কমিয়া যায়। এ জন্য তিনি তলপেট ও তার আশেপাশে ঠাণ্ডা জল লাগাইতে বলেন। এই স্নানের কাজ সহজ করার জন্য তিনি এক বিশেষ রকমের টিনের টব বানাইয়াছেন। আমরা তাহা ছাড়াও কাজ চালাইতে পারি। ছত্রিশ ইঞ্চি মাপের বা তাহা অপেক্ষা কিছু

ছোট বড় টিনের চাদরের পাতলা ডিম্বাকৃতি টব বা গাম্‌লা বাজারে পাওয়া যায়। নিজেদের শরীরের মাপ অনুসারে স্ত্রী-পুরুষকে প্রয়োজন মত টব সংগ্রহ করিতে হইবে। গামলার তিন-চতুর্থাংশ জলে পুরিয়া তাহার ভিতর রোগীকে এমনভাবে বসাইবে যে, তাহার পা ও ধড় জলের বাহিরে থাকে—নাভি হইতে জঙ্ঘা পর্য্যন্ত জলে ডোবা থাকে। পা দু'খানি কোনো পিড়ি অথবা পাটের উপর রাখিলে ভাল হয়। রোগী সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া জলে বসিবে। ঠাণ্ডা লাগিলে পা ও শরীর কম্বল দিয়া ঢাকিয়া দিবে; রোগী জামাও পরিতে পারে; কিন্তু এসব যেন জলে না ভিজে। যেখানে আলো, বাতাস ও রৌদ্র আসে সেরূপ যায়গায় এই স্নান করিবে। জলে বসিয়া রোগী একখানি ছোট খস্‌খসে রুমাল বা তোয়ালে দিয়া নিজের পেট ধীরে ধীরে মলিবে বা অন্যের দ্বারা মলাইবে। পাঁচ মিনিট হইতে আধঘণ্টা অথবা আরও কিছু বেশী সময় পর্য্যন্ত এই স্নান করা যায়। প্রায়ই এই স্নানের ফল টাট্‌কা পাওয়া যায়। রোগীর যদি অজীর্ণ রোগ থাকে, তবে এই চিকিৎসায় বায়ু নিঃসরণ হইবে অথবা ঢেঁকুর উঠিবে, জর থাকিলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুই এক ডিগ্রী কমিয়া যাইবে। ইহাতে কোষ্ঠ সাফ হয়, ক্লান্তি দূর হয়, যাহার ঘুম হয় না তাহার মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হইয়া ঘুম আসে, আর যাহার বেশী ঘুম পায়, জড়তা দূর হইয়া তাহার শরীর তাজা হয়। ভাসা ভাসা রকমে দেখিলে এই স্নানে যে পরস্পরবিরোধী ফল পাওয়া যায়, তাহা অসম্ভব মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক অনিদ্রা ও অতি নিদ্রা যে এরূপে দূর হয় ইহা সত্য। আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী ঠেকিলেও অনিদ্রা ও অতিনিদ্রা একই কারণ হইতে সম্ভূত। অতিসার ও কোষ্ঠবদ্ধ দুইই বদহজমের ফল—অজীর্ণের ফলে কাহারও বেশীবার দাস্ত হয় কাহারও কোষ্ঠবদ্ধ হয়;

কুনের স্নানে এই দুটিই আরোগ্য হয়। খাওয়া প্রভৃতিতে সাবধান হইলে, এই স্নানে পুরাতন অর্শরোগও সারে। যাহাদের বেশী থুথু ফেলিতে হয় ইহাতে তাহাদেরও উপকার হইবে। এই স্নানে দুর্ব্বল মানুষও বলবান হয়। ইহাতে অনেকের গিঁটে বাত পর্য্যন্ত ভাল হইয়াছে। রক্তস্রাব ও রক্তদুষ্টি ও মাথা ধরা ইহাতে দূর হয়। কুনে বলেন, এই উপায়ে ক্যানসারের মত ভয়ানক রোগও দূর হয়। গর্ভবতী নারী মধ্যে মধ্যে এই স্নান করিলে, সহজেই তাহার সন্তান প্রসব হইবে। বালক, যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই এই স্নান করিতে পারে।

আর এক রকমের স্নান আছে। কয়েকটি রোগে ইহাতে ভাল ফল পাওয়া যায়। ইহাকে 'ভিজে চাদর চাপা' কহে। খোলা হাওয়ায় একখানি লম্বা টেবিল অথবা তক্তার উপর চারিটি অথবা তাহার অপেক্ষা কম বেশী কম্বল পাতিতে হইবে। কম্বলের ধার যেন বাহিরে ঝুলিয়া পড়ে। ইহার উপর দুটি মোটা সাফ চাদর ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া বিছাইয়া দিবে—ইহাও যেন ঝুলিয়া বাহিরে পড়ে। এক দিকে কম্বলের নীচে একটা বালিশ দিবে। রোগী তাহার উপর উলঙ্গ হইয়া শুইবে। ইচ্ছা করিলে সে একখানি রুমাল বা ল্যাঙ্গোট কোমরে জড়াইতে পারে। রোগীকে শোয়ান হইলে ঝুলান চাদর ও কম্বল এক এক করিয়া তাহার গায়ের উপর দুই দিক হইতে দিবে। রোদ থাকিলে রোগীর মুখ ও মাথার উপর ভিজা রুমাল্ জড়াইয়া দেওয়া যায়। নাক খোলা রাখিবে। একটু পরেই রোগীর শীতে কাঁপুনী আরম্ভ হইবে। পরে গরম লাগিবে ও আরাম ঠেকিবে। এই অবস্থায় পাঁচ মিনিট হইতে এক ঘণ্টা বা তাহার বেশী শুইয়া থাকিতে পারে। পরে সে ঘামিতে থাকিবে। অনেক সময় রোগী এ অবস্থায় ঘুমাইয়া পড়ে। রোগীকে চাদরের বাহিরে আনিয়া ঠাণ্ডা জলে স্নান করাইবে। অনেক চর্ম্মরোগ

এইরূপে সারে। চুলকানি, দাদ, গাত্রদাহ, জলবসন্ত, বসন্ত, সাধারণ ফোড়া, জ্বর প্রভৃতিতে 'ভিজে চাদর চাপায়' বিশেষ উপকার হয়। অতি ভয়ঙ্কর বসন্ত রোগও এই প্রণালীতে আরোগ্য হয়। শরীরের উপর লাল চাকা-চাকা দাগ হইলেও এই স্নানে তাহা দূর হইবে। এই স্নান সহজেই যে কেহ শিখিতে এবং অন্যকে শিখাইতে পারে। সকলেই ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারে। এই স্নানে শরীরের অনেক ময়লা চাদরে লাগিয়া যায়। এজন্য একবার ব্যবহার করা করা চাদর স্ফুটন্ত জলে সিদ্ধ না করিয়া অপর কোনো রোগীকে দিবে না অথবা অন্য কোনো কাজে লাগাইবে না।

শেষ কথা—জল চিকিৎসার সময় মনে রাখিতে হইবে হাওয়া, জল, খোরাক ও ব্যায়াম ইত্যাদির নিয়ম উপেক্ষা করিয়া কেবল জল-চিকিৎসা করিলে বিশেষ কোনো উপকার হইবে না। কোনো গিঁটে বাতের রোগী যদি কুনের স্নান করা আরম্ভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে অভক্ষ্য ভক্ষণ করে, অপরিষ্কার, দুর্গন্ধময় জায়গায় থাকে এবং শারীরিক পরিশ্রম না করে, তবে শুধু স্নানে তাহার কোনো উপকার হইবে না। স্বাস্থ্য-রক্ষার সকল নিয়ম পালন করিয়া জল চিকিৎসা করিলে উপকার হইবে এবং শীঘ্রই ব্যাধি দূর হইবে।

—তৃতীয় অধ্যায়—

মাটি-চিকিৎসা

এখন মাটি-চিকিৎসার উপকারিতা সম্বন্ধে কিছু বলিব। অনেক রোগে ইহা জল চিকিৎসা অপেক্ষা বেশী উপকারী। আমাদের শরীরের বেশীর ভাগ মাটি দিয়া তৈরী, এজন্য মাটির এই গুণ দেখিয়া আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নাই। অনেকে মাটিকে পবিত্র মনে করে। দুর্গন্ধ দূর করার জন্য আমরা মাটি দিয়া ঘর প্রভৃতি লেপি। বাতাস দূষিত হইবার ভয়ে আমরা পচা জিনিষ মাটি দিয়া ঢাকি; মাটি দিয়া আমরা হাত পরিষ্কার করি। শরীরের গুপ্ত অঙ্গও মাটি দিয়া পরিস্কার করা হয়। যোগীরা তাঁহাদের শরীরে মাটি লাগান। দক্ষিণ আফ্রিকার স্থানীয় অধিবাসীরা মাটি লাগাইয়া ফোড়া ও ঘা আরাম করে। মৃতদেহ মাটির ভিতর পুতিয়া রাখিলে হাওয়া খারাপ হয় না। এই সব ব্যাপার দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে, মাটির দুর্গন্ধ নাশ ও রোগ দূর করার শক্তি আছে।

লুই কুনে জল সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা করিয়া যেমন অনেক কথা লিখিয়াছেন, ঐরূপ জুষ্ট নামক এক জার্ম্মান ডাক্তার মাটী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অনেক কিছু লিখিয়াছেন। তিনি এতদূর পর্য্যন্ত কহিয়াছেন যে, মাটীর ব্যবহারে অনেক অসাধ্য রোগও আরোগ্য হইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন, তাহার পাশের গ্রামের এক ব্যক্তিকে সাপে কাটে। অনেকে মনে করে, সে মারা গিয়াছে। কেহ কেহ তাহাকে জুষ্টের নিকট লইয়া যাইতে বলে। জুষ্ট তাহাকে মাটিতে পুতিয়া ফেলেন। অল্পক্ষণ পর তাহাকে বাহির করিয়া দেখা গেল যে, তাহার

চেতনা হইয়াছে। ইহা অসম্ভব নহে। জুষ্ট মিথ্যা কথা লিখেন নাই। দেখা যায় মাটীতে পুতিলে শরীরে তাপ জন্মে। মাটীর ভিতর যে সব অদৃশ্য জীবজন্তু আছে, দেহের উপর তাহাদের কি প্রভাব পড়ে, তাহা আমাদের জানার উপায় নাই। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ যে, বিষ প্রভৃতি চুষিয়া লইবার ক্ষমতা মাটির আছে। জুষ্ট লিখিয়াছেন, কেহ যেন মনে না করেন, সকল সাপে-কাটা রোগী মাটি-চিকিৎসায় বাঁচিয়া উঠিবে। তবে সাপে কাটিলে মাটি-চিকিৎসা করা দরকার। ভীমরুল ও বিছার কামড়ে মাটির ব্যবহারে আরাম হইতে দেখিয়াছি। ঠাণ্ডা জলে মাটি গুলিয়া কাদা করিয়া পুরু পুলটিস বানাইয়া কামড়ান স্থানে কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

আমি নিজেই নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারে মাটি ব্যবহার করিয়া সুফল পাইয়াছি। পেটের অসুখে তলপেটের উপর মাটির পুলটিস বাঁধায় দুই তিন দিনে অসুখ সারিয়াছে। মাটির পুলটিসে মাথার অসুখ শীঘ্রই আরোগ্য হইয়াছে। চোখ উঠিলেও এই পুলটিস বাঁধায় উপকার হইয়াছে। আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে পুলটিস বাঁধিয়া ফোলা এবং বেদনা দুইই কমিয়াছে। অনেক দিন পর্য্যন্ত ফ্রুট সণ্ট বিনা আমার চলিত না। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মাটির উপকারিতা বুঝিয়া তখন হইতেই ফ্রুট সণ্ট ইত্যাদি ছাড়িয়া দিয়াছি। পরে কোনো দিন আর ইহা ব্যবহার করার দরকার হয় নাই। কোষ্ঠবদ্ধ, অতিসার ও পেটের বেদনা কাদার পট্টী বাঁধিয়া আরোগ্য হইয়াছে। প্রবল জ্বরে মাথায় আর তলপেটে মাটি বাঁধিয়া এক ঘণ্টার ভিতর জ্বর খুব কমিয়াছে। ফোড়া, ঘা, দাদ ও চুলকানিতে মাটির পুলটিস প্রায়ই সুফল দেয়। যে ফোড়া হইতে পূঁজ নির্গত হইতেছে, তাহাতে মাটির প্রলেপ দিলে বেশী উপকার হয় না। আগুনে অথবা গরম জলে গা পুড়িলে কাদার পুলটিসে জ্বালা কম হয় এবং ফোস্কা

পড়ে না। এইরূপে অর্শও আরোগ্য হয়। ঠাণ্ডা লাগিয়া হাত পা লাল হইলে ও ফুলিলে মাটির পুলটিস অব্যর্থ মহৌষধ। মাটির-চিকিৎসায় পেট ফাঁপাও কমে। মাটির ব্যবহারে গিঁটেবাতে শীঘ্রই উপকার পাওয়া যায়।

মাটির ব্যবহার করিয়া আমার মনে হইয়াছে যে, গৃহ-চিকিৎসার পক্ষে মাটি এক অপূর্ব্ব বস্তু। সব রকম মাটি সমান উপকারী নহে। পরিষ্কার যায়গার শুক্‌না মাটি বেশী উপকারী। ইহা যেন বেশী এঁটেলো না হয় এবং ইহাতে যেন গোবর ইত্যাদি ময়লা না থাকে। দোঁয়াস মাটিই ভাল। সূক্ষ্ম চালুনী দ্বারা মাটি চালিয়া লইবে। মাখা আটার ন্যায় মাটি কিছু কড়া রাখিবে। পরে মাড়শূন্য কাপড়ে বাঁধিয়া পুলটিসের ন্যায় লাগাইবে। শরীরের উপর শুকাইবার পূর্ব্বেই মাটি সরাইয়া লইবে। একবারের পুলটিস দুই তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত চলিবে। একবার ব্যবহার করা মাটি আর ব্যবহার করিবে না। কিন্তু কাপড় ভালভাবে ধুইয়া আবার ব্যবহার করা যায়। তলপেটে পুলটিস দিতে হইলে, প্রথমে একখানি গরম কাপড় দিয়া তলপেট ঢাকিয়া তার উপর পুলটিস বাঁধিবে। প্রত্যেকেরই একটি পাত্র ভরিয়া এইরূপ মাটি রাখিয়া দেওয়া উচিত; ইহাতে প্রয়োজনের সময় খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না। বিছা প্রভৃতি কামড়াইলে যত সত্বর মাটি লাগান যায়, তত বেশী উপকার হয়।

—চতুর্থ অধ্যায়—

জ্বর ও তাহার প্রতিকার

প্রধান প্রধান চিকিৎসার কথা আলোচনা করার পর এখন কয়েকটি বিশেষ রোগ ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

শরীর খুব গরম হইলেই আমরা জ্বর হইয়াছে বুঝি। ইংরেজ ডাক্তারগণ জ্বরকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক শ্রেণীর পৃথক চিকিৎসা-প্রণালী সম্বলিত বড় বড় বই লিখিয়াছেন। অধিকাংশ জ্বর একই প্রণালীর চিকিৎসায় আরোগ্য হইতে পারে। সাধারণ জ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া বিউবোনিক প্লেগের জ্বরে আমি এক ঔষধ ব্যবহার করিয়াই ভাল ফল পাইয়াছি। ১৯০৪ সালে আফ্রিকায় আমাদের মধ্যে প্লেগ দেখা দেয়। ২৩ জন প্লেগাক্রান্ত হয়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২১ জন মারা যায়। দুই জনকে হাসপাতালে পাঠান হয়। ঐ দুই জনের একজন শেষ পর্য্যন্ত জীবিত ছিল; এবং মাত্র ঐ ব্যক্তিকে মাটির পুলটিস্ দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে একথা বলা চলে না যে, মাটিই তাহার উপকার করিয়াছিল; তবে এ পর্য্যন্ত বলা যায় যে, মাটি তাহার কোনো ক্ষতি করে নাই। উভয়েরই ফুসফুস ফুলিয়া জ্বর হইয়াছিল। তাহাদের কাহারও জ্ঞান ছিল না।

প্রায় সব জ্বরই পেট খারাপ হইয়া হয়। এজন্য রোগীকে প্রথমে উপবাস করাইবে। কোনো দুর্ব্বল লোক বা জ্বররোগী না খাইলে আরও দুর্ব্বল হইয়া যাইবে ইহা মনে করা মস্ত ভুল। যতটা খোরাক হজম হইয়া রক্তে পরিণত হয় ততটাই কাজে লাগে, বাকী খাদ্য পেটে পাথরের মত

পড়িয়া থাকে। জ্বর-রোগীর হজমশক্তি কমিয়া যায়, জিহ্বার উপর কাল বা সাদা ময়লা জমে, ঠোঁট শুকাইয়া আসে। এ অবস্থায় কিছু খাওয়াইলে তাহার জ্বর নিশ্চয়ই বাড়িবে। খাওয়া একদম বন্ধ করিয়া দিলে পাকস্থলী একটু বিশ্রাম পায় এবং হজমশক্তি বাড়ে। এজন্য রোগী দুই এক দিন লঙ্ঘন দিবে। উপবাসের দিনেও 'কুনের স্নান' করিবে। দিনে কমপক্ষে দু'বার ঐরূপ স্নান করা চাই। রোগী স্নান করিতে সক্ষম না হইলে, তলপেটে মাটির পুলটিস দিবে। মাথার বেদনা থাকিলে, অথবা মাথা বেশী গরম হইলে, মাথার উপরও মাটির পট্টি বাঁধিবে। শরীর ঢাকিয়া রোগীকে যথাসম্ভব খোলা হাওয়ায় রাখিবে। কমলা লেবুর রস ছাঁকিয়া, তাহাতে প্রয়োজন মত ঠাণ্ডা অথবা ফুটন্ত জল মিশাইয়া তাহাই রোগীকে খাইতে দিবে। তাহাতে চিনি না দিলে ভাল হয়। এই জল পান করিলে বিশেষ উপকার হয়। যদি রোগীর দাঁতে টক না লাগে, আর যদি সে খাইতে পারে তবে উপরের রীতিতে প্রস্তুত লেবুর রসও তাহাকে দেওয়া যায়। ইহার পর এক-আধটা কলা, এক-আধ চামচ জলপাইএর তেল এবং এক-আধ চামচ লেবুর রস খুব ভাল করিয়া মিশাইয়া তাহাকে খাইতে দিবে। পিপাসা লাগিলে ফুটন্ত জল ঠাণ্ডা করিয়া অথবা লেবুর রস মিশান জল দিবে। জল না ফুটাইয়া কখনও দিবে না। জল পরিষ্কার করার উপায় প্রথমে বলা হইয়াছে। রোগীকে খুব কম কাপড় পরিতে দিবে, আর তাহা ঘন ঘন বদলাইবে। গায়ে জড়াইবার কাপড় যথেষ্ট থাকিলে, অন্য কাপড় দেওয়ার দরকার নাই। এই চিকিৎসায় সান্নিপাতিক জ্বরের ন্যায় ভয়ানক জ্বরও সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছে। কুইনাইন ইত্যাদি ঔষধেও জ্বর ছাড়ে; কিন্তু কুইনাইন ব্যবহারে অন্য রোগ সৃষ্টি হয়। লোকে বলে যে, কুইনাইন ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ মহৌষধ। কিন্তু আমার বিশ্বাস কুইনাইনে

ম্যালেরিয়া স্থায়ীভাবে দূর হয় না। উপরে বর্ণিত চিকিৎসা-প্রণালীতে আমি ম্যালেরিয়া রোগীকেও সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি।

অনেকে জ্বরের সময় দুধ খাইয়া থাকেন। কিন্তু দেখিয়াছি, জ্বরের প্রথম অবস্থায় দুধ দিলে ক্ষতি হয়। দুধ দিতে হইলে, কিছু গম অথবা চাউলের গুঁড়া ও জল দুধে দিয়া পাক করিয়া দিবে। কিন্তু জ্বরের প্রকোপ বেশী থাকিলে এরূপেও দুধ দেওয়া যায় না। এ অবস্থায় লেবুর রস মিশান জল খুব চমৎকার ফল দেয়। রোগীর জিহ্বা পরিষ্কার হইলে উপরে লেখা নিয়মে কলা দেওয়া যাইতে পারে। রোগীর দাস্ত না হইলে, রেচক ঔষধ দেওয়ার বদলে অল্প সোহাগা মিশাইয়া গরম জলের পিচকারী দিবে; ইহাতে পেট সাফ হইবে; আর খাদ্যের সহিত জলপাইএর তেল থাকিলে পেট পরিষ্কার থাকিবে।

—পঞ্চম অধ্যায়—

কোষ্ঠবদ্ধতা, আমাশয়, শূলবেদনা ও অর্শ

এই অধ্যায়ে একসাথে চারটি রোগের আলোচনা করিতেছি দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য্য হইবেন। কিন্তু এই রোগ চারটির পরস্পর খুব নিকট সম্বন্ধ আছে এবং ইহাদের চিকিৎসা প্রণালীও প্রায় একই প্রকার। পাকস্থলী যখন বদহজমী জিনিষে পূর্ণ হইয়া ভারী হয়, তখন শরীর গঠনের তারতম্য অনুসারে কাহারও কোষ্ঠবদ্ধ হয়; দাস্ত নিয়মানুসারে হয় না অথবা খোলসা হয় না, মলত্যাগের সময় কোঁথ দিতে হয়। কাহারও বা রক্ত পড়িতে সুরু করে এবং ইহা হইতে আমাশয় অথবা অর্শ দেখা দেয়। কাহারও বেশীবার দাস্ত হয় এবং ইহা হইতেও আমাশয় হয়। কাহারও বা শূলবেদনা হয়—পেট কামড়ায় ও আম পড়ে।

এই সকল স্থলেই রোগীর ক্ষুধামান্দ্য হয়, শরীর ফ্যাকাশে ও দুর্ব্বল হয়, জিহ্বায় ময়লা জমে এবং প্রশ্বাস দুর্গন্ধ হয়, অনেকের মাথা ধরে, কাহারও কাহারও অন্য রোগও হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা এরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে যে, ইহা আরোগ্যের জন্য শত শত প্রকার বড়ি ও চূর্ণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফ্রুট সল্টের ন্যায় পেটেন্ট ঔষধের প্রধান গুণ এই যে, ইহারা সাময়িকভাবে কোষ্ঠবদ্ধ দূর করে; এজন্য হাজার হাজার লোক স্থায়ী-ভাবে কোষ্ঠবদ্ধ হইতে মুক্ত হইবার বৃথা আশায় এইরূপ ঔষধের পিছনে ছুটাছুটি করিয়া হয়রাণ হয়। যে কোনো বৈদ্য অথবা হেকিমকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিবেন যে, বদ-হজমের জন্যই কোষ্ঠবদ্ধতা ইত্যাদি হয় এবং অজীর্ণতা দূর করাই এই সব দূর করার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

ডাক্তার কবিরাজদের মধ্যে যাঁহারা সরল-প্রকৃতি, তাঁহারা স্বীকার করেন যে, রোগীরা তাহাদের বদ অভ্যাস ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে, কিন্তু রোগ দূর করিতে চায় বলিয়া, তাঁহারা বড়ি ও চূর্ণ প্রস্তুত করিতে বাধ্য হন। বর্ত্তমানে এইরূপ ঔষধের বিজ্ঞাপনে এ পর্য্যন্ত লেখা হয় যে, ঔষধ সেবনকালে রোগী ইচ্ছামত আহার-বিহার করিতে পারিবে, তাহাকে কোনো নিয়ম-কানুন মানিতে হইবে না, শুধু ঔষধ খাইলেই রোগ দূর হইবে। পাঠকদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না, ইহা নিছক দাগাবাজি। সকল রকম জোলাপই শরীরের অনিষ্ট করে। অতি মৃদু রেচকও পেট সাফ করিয়া অন্য রোগ উৎপন্ন করে। জোলাপ লইয়া কেহ যদি পূর্ব্বের খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করে এবং তাহাকে আবার জোলাপ লইতে না হয়, তবে জোলাপ লওয়ায় লাভ হইয়াছে বলা যায়; নতুবা জোলাপ লইয়া কোষ্ঠবদ্ধতা ইত্যাদি দূর হইলেও, নূতন ব্যাধির আক্রমণ অনিবার্য্য।

কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদি অসুখ থাকিলে, প্রথমেই খাদ্যের পরিমাণ বিশেষত ঘি, চিনি, সর, রাবড়ি প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য কমাইতে হইবে। রোগীকে সম্পূর্ণরূপে মদ, তামাক, ভাঙ, চা, কফি, কোকো এবং কলের ময়দার পাঁউরুটি ত্যাগ করিতে হইবে। যথেষ্ট পরিমাণে টাট্‌কা ফল জলপাইএর তেলের সহিত খাইতে হইবে।

চিকিৎসার পূর্ব্বে রোগীকে ৩৬ ঘণ্টা উপবাস করিতে হইবে। এই সময় এবং পরে শুইবার সময় তলপেটে মাটির পুলটিস বাঁধিতে হইবে; এবং দিনের মধ্যে দু'একবার 'কুনের স্নান' করিতে হইবে। রোগীকে প্রত্যহ কমপক্ষে দু'ঘণ্টা হাঁটিতে হইবে। এই চিকিৎসা দ্বারা আমি সাংঘাতিক কোষ্ঠবদ্ধ, আমাশয়, অর্শ ও শূলবেদনা আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি। অর্শের বলি ইহাতে দূর হইবে না; কিন্তু অর্শের জন্য

তাহার কষ্ট হইবে না, বলি আছে কি না সে কথা তাহার মনেই থাকিবে না। যতক্ষণ রক্ত অথবা আম পড়িতে থাকিবে, ততক্ষণ লেবুর রস মিশান গরম জল ভিন্ন আর কিছুই খাওয়া শূলবেদনা রোগীর নিষেধ। বেশী পেট কামড়ান থাকিলে, খুব গরম জলের বোতল বা গরম ইট দিয়া সেঁক দিলে তাহা দূর হইবে। বলা বাহুল্য, রোগীকে সব সময় খোলা হাওয়ায় রাখিতে হইবে।

ফরাসী কুল, মনাক্কা, কলা, কমলানেবু, কিসমিস্ ও আঙ্গুর কোষ্ঠবদ্ধে বিশেষ উপকারী। অবশ্য ক্ষুধা না থাকিলে এগুলি খাইবে না। পেট-কামড়ানর সাথে মুখ যদি বিস্বাদ হয়, তাহা হইলে এগুলি খাওয়াই উচিত নয়।

—ষষ্ঠ অধ্যায়—

সংক্রামক রোগ—বসন্ত

সকল রোগ অনেকাংশে একই কারণে উৎপন্ন হয় এবং তাহাদের ঔষধও প্রায় একই ধরণের। এজন্য প্রত্যেক রোগের স্বতন্ত্র আলোচনা করা দরকার নাই। এখন আমরা সংক্রামক রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বসন্ত ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যধির উৎপত্তির কারণ আমি একই মনে করি। ইহার ভিতর বসন্ত প্রধান বলিয়া এ সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় লেখা হইল; বাকী গুলি আর একটি অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।

বসন্ত রোগকে আমরা বড় ভয় করি; এ সম্বন্ধে আমাদের অনেক কুসংস্কার আছে। বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী রূপে আমরা শীতলা দেবীর পূজা করি; অনেকে তাঁহার নিকট মানত করে*। পেট অপরিষ্কার থাকিলে রক্ত দূষিত হইয়া, অন্যান্য ব্যাধির ন্যায় বসন্ত রোগও হয়; শরীরে সঞ্চিত বিষ বসন্ত-আকারে দেখা দেয়। এ কথা ঠিক হইলে বসন্ত হইতে ভয় করার কিছুই নাই। যদি বসন্ত রোগীকে ছুঁইলেই বসন্ত হইত, তবে যাহারা এরূপ রোগীকে ছোঁয়, তাহাদের সকলেরই ইহা হইত; কিন্তু সব সময় এরূপ হয় না। বাস্তবিক কতকগুলি বিষয়ে সাবধান হইয়া রোগীকে ছুঁইলে কোনো ভয়ের কারণ নাই। তবে একথা জোর দিয়া বলা যায় না যে, ইহা মোটেই সংক্রামক নহে;

* বসন্ত হইলে অনেক বাঙালী বলেন, 'মায়ের কৃপা হইয়াছে'—অনুবাদক

যাহার শরীর এই রোগে আক্রান্ত হইবার উপযুক্ত, বসন্ত রোগীর সংশ্রবে আসিলে তাহার বসন্ত হইতে পারে। এই জন্যই যেখানে বসন্ত দেখা দেয়, সেখানে একসঙ্গে অনেকেই এই রোগে আক্রান্ত হয়। ইহাতে লোকের ধারণা জন্মিয়াছে যে, বসন্ত রোগ সংক্রামক। টীকা লইলে বসন্ত হয় না, ইহা বলিয়া লোককে ঠকান হয়।

বসন্ত রোগীর টীকার রস গরুর পালানে লাগাইয়া তাহা হইতে যে রস পাওয়া যায় তাহাই টীকার বীজ। এই রস আমাদের শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। বলা হয় যে, টীকা নিলে অল্প কয়েকটি বসন্তের গুটি দেখা দেয়.বলিয়া, পরে আর বসন্ত হয় না। প্রথম প্রথম বলা হইত, একবার টীকা নিলে জীবনে আর টীকা দিতে হইবে না; কিন্তু যখন দেখা গেল যে টীকা-লওয়া লোকেরও বসন্ত হইয়াছে, তখন বলা হইল যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর টীকা লওয়া দরকার। আজকাল যেখানে বসন্ত সংক্রামক ভাবে দেখা দেয়, সেখানে টীকা-লওয়া ও না-লওয়া সকল লোকের টীকা লওয়ার রেওয়াজ চলিত হইয়াছে; পাচ ছয় বার অথবা তাহা অপেক্ষা বেশী বার টীকা-লওয়া লোকও অনেক পাওয়া যাইবে।

টীকা লওয়া একটি বর্ব্বর প্রথা। বর্ত্তমান প্রচলিত অতি সাংঘাতিক ভুলের ইহা অন্যতম। তথাকথিত অসভ্য জাতিদের ভিতর এই ভুল নাই.। যাহাদের কোনো আপত্তি নাই শুধু তাহারা টীকা লইলেই এই ভুলের পক্ষপাতী লোকে সন্তুষ্ট নহে, তাহারা আইনের সাহায্যে সকলের টীকা দিতে চায়। টীকা লইতে অস্বীকার করিলে মোকদ্দমা চালাইয়া কঠোর শাস্তি পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। টীকা দেওয়ার প্রথা বেশী পুরাতন নহে; মাত্র ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোকের এই ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে যে, টীকা লইলে

আর বসন্ত হয় না। যাহারা টীকা লয় না, তাহাদের যে বসন্ত হইবেই, এ কথা কেহ বলিতে পারে না; কারণ টীকা না লইয়াও অনেকে ইহাতে আক্রান্ত হয় না। যাহারা টীকা লয় নাই, তাহাদের কেহ কেহ বসন্তে আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া ইহাও বলা চলে না যে, টীকা লইলেই তাহাদের বসন্ত হইত না।

তাহা ছাড়া, টীকা লওয়া একটি নোংরা প্রথা; কারণ ইহার ভিতর শুধু গরুর শরীরের পূঁজরক্ত থাকে না, ইহাতে বসন্ত রোগীর শরীরের পূঁজরক্তও থাকে। ইহা আমাদের শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। লোকে সাধারণত বসন্তের পূঁজরক্ত দেখিলেই বমি করে। ইহা কাহারও হাতে লাগিলে, সে সাবান দ্বারা হাত ধোয়। যদি ঠাট্টা করিয়াও কেহ আমাদের ঐ পূঁজরক্ত চাখিয়া দেখিতে বলে, তবে আমরা চটিয়া গিয়া মারামারি পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত হই। কিন্তু আমাদের ভিতর যাহারা টীকা লন, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই ধারণা করিতে পারেন, টীকা লইয়া তাঁহারা কার্য্যত সেই বসন্তের রস অর্থাৎ পূঁজরক্ত খাইতেছেন। প্রায় সকলেই জানেন যে, বহু রোগে ঔষধ ও তরল খাদ্য মুখ দিয়া না খাওয়াইয়া যন্ত্রের সাহায্যে শরীরের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেওয়া (ইনজেক্ট করা) হয়। মুখ দিয়া খাওয়া জিনিষ তাড়াতাড়ি রক্তের সহিত মিশিতে পারে না, কিন্তু ইন্‌জেক্‌শন করা জিনিষ তৎক্ষণাৎ রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। এইরূপে যে ঔষধ অথবা আহার গ্রহণ করা হয়, তাহা মুখ দিয়া খাওয়ার সমান। তথাপি আমরা টীকা লইতে পশ্চাদপদ হই না। কথা আছে, ভীরুরা মৃত্যুর পূর্ব্বেই বহুবার মরে; মৃত্যুভয়ে এবং কুরূপ হইবার ভয়েই আমরা টীকা লইবার জন্য পাগল হই।

আমার মতে টীকা লওয়া ধর্ম্ম ও নীতি-বিরুদ্ধ। যাহাদের মাংস

খাওয়ার অভ্যাস আছে, তাহারাও মৃত জন্তুর রক্ত খাওয়াকেও ভয়ানক ব্যাপার মনে করে। টীকা লইলে তো নিরপরাধ জীবিত জন্তুর বিষাক্ত রক্তপান করাই হয়। টীকা লওয়া অপেক্ষা বসন্তে ভুগিয়া মরাও ধর্ম্মভীরু লোকে বেশী পছন্দ করিবে।

ইংলণ্ডের কয়েকজন চিন্তাশীল লোকে টীকা দেওয়ার অনিষ্ঠকারিতা সম্বন্ধে খুব পরিশ্রম করিয়া গবেষণা করিয়াছেন। সেখানে একটি টীকা-বিরোধী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ইহার সভ্যগণ টীকা লন না। তাঁহারা টীকা দেওয়া এবং এ সম্বন্ধে যে আইন আছে প্রকাশ্য ভাবে তাহার বিরুদ্ধে প্রচার করেন। এ জন্য অনেকে জেলে গিয়াছেন। তাঁহারা সকলকে টীকা লইতে নিষেধ করেন। এ সম্বন্ধে বহু পুস্তিকা লেখা হইয়াছে এবং বাদবিবাদ চলিতেছে। টীকার বিরুদ্ধে তাঁহারা এই সব আপত্তি পেশ করেন :—

(১) গাই অথবা বাছুরের পালান হইতে টীকার বীজ লওয়ার সময় তাহাদের উপর ভয়ানক নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়। লক্ষ লক্ষ পশুকে এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে যন্ত্রণা দেওয়া মানুষের সাজে না। কিছু উপকার হইলেও নিষ্ঠুরভাবে সংগৃহীত এই রস কাহারও ব্যবহার করা উচিত নহে।

(২) এই বীজ ব্যবহারে কোনো উপকার হয় না, বরং অপকারই হয়—শরীরে অপর নূতন রোগ হয়। টীকার পক্ষপাতীরাও স্বীকার করিয়া থাকেন যে, টীকা দিলে অন্য রোগ হয়।

(৩) বসন্ত রোগীর শরীর হইতে মূল বীজ গ্রহণ করা হয়। ঐ রোগীর যে সব রোগ থাকে, বসন্তের বীজে সে সব রোগের জীবাণু সংক্রামিত হইতে পারে।

(৪) টীকা নিলে যে বসন্ত হইবে না তাহার কোনো নিশ্চয়তা নাই। টীকার আবিষ্কর্ত্তা ডাক্তার জেনর প্রথমে বলেন, এক হাতে একখানি টীকা লইলে আর কখনও বসন্ত হইবে না। যখন দেখা গেল যে, ইহাতে উপকার হইতেছে না তখন বলা হইল, দুই হাতে টীকা নিলে সুফল পাওয়া যাইবে; ইহাতেও কোনো ফল না হইলে বলা হইল, দুই হাতে একাধিক স্থানে টীকা দিতে হইবে। তার পরেও বসন্ত হইতে থাকিলে উপদেশ করা হইল, টীকা দেওয়ার সাত বৎসরের ভিতর বসন্ত হইবে না; এই সময় সাত বৎসর হইতে এখন তিন বৎসরে নামিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ডাক্তাররা নিজেরাই এ বিষয়ে কিছু স্থির করিতে পারেন নাই। বাস্তবিক, টীকা লইলে যে বসন্ত হইবে না, এরূপ মনে করা ভুল। কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না, টিকা লইয়া যাহার বসন্ত হয় নাই, টীকা লইলেই তাহার বসন্ত হইত।

(৫) বসন্তের বীজ একটি নোংরা জিনিষ। ময়লা দিয়া ময়লা দূর করা যায়, এরূপ আশা করা মূর্খতা।

এই সব এবং এইরূপ আরও যুক্তি দেখাইয়া এই সমিতি ইংরেজ জনসাধারণের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইংলণ্ডের একটি সহরের অধিকাংশ লোক টীকা লয় না; আর লোকসংখ্যার অনুপাতে সেখানে বসন্ত খুব কম হয়। ডাক্তারদের স্বার্থপরতাই টীকা দেওয়ারূপ ভুল প্রথাকে লোপ পাইতে দিতেছে না। তাঁহারা টীকা দিয়া প্রতি বৎসর বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। এজন্য টীকা দিলে যে অনিষ্ট হয়, তাহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না। অবশ্য এমন কয়েকজন ডাক্তার আছেন, যাঁহারা ইহার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়া, টীকা দেওয়ার ঘোর বিরোধী হইয়াছেন।

টীকা লওয়া উচিত কি না?—যাঁহারা মনে করেন, টীকা লইলে ধর্ম্মহানি হয়, তাঁহারা যেন কখনও টীকা না লন। এ জন্য প্রচলিত আইন অনুসারে যে কোনো শাস্তি অথবা নির্যাতন ভোগ করার জন্য তাঁহাদের প্রস্তুত থাকিতে হইবে। একাকী হইলেও যাহা সত্য বলিয়া মনে হইয়াছে, প্রয়োজন হইলে তাঁহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া সমগ্র জগতের বিরুদ্ধে তাঁহাকে দাঁড়াইতে হইবে। যাঁহারা শুধু স্বাস্থ্যের খাতিরে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন, তাহারা যেন এ সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ই ভাল করিয়া জানিয়া লন এবং তাঁহাদের মত যে ঠিক তাহা অপরকে বুঝানর শক্তি অর্জ্জন করেন এবং প্রচার প্রভৃতি দ্বারা সকলে ঐ পথে যাহাতে চলে সে জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেন। এ সম্বন্ধে যাঁহাদের কোনো নিশ্চিত মত নাই, অথবা নিজেদের বিশ্বাস অনুসারে চলার সাহস যাঁহাদের নাই, তাঁহারা যেন দেশের আইন মানেন, এবং অন্য লোকজন যে ভাবে চলে, সেইভাবে চলেন।

যাঁহারা টীকা লইতে আপত্তি করেন, তাঁহারা যেন পূর্ব্ববর্ণিত স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি কড়াকড়ির সহিত পালন করেন; কারণ এগুলি কঠোর ভাবে পালন করিলে শরীরের রোগ-জীবাণু প্রতিরোধ করার শক্তি বাড়ে এবং ইহাই লোককে বসন্ত ও অন্যান্য ব্যাধির হাত হইতে মুক্ত রাখে। বিষাক্ত বসন্ত-বীজ শরীরের ভিতর যিনি গ্রহণ করিতে না চান, তিনি যদি ইন্দ্রিয় সেবায় মত্ত থাকিয়া আরও অনিষ্টকর বিষয়-রস গ্রহণে ব্যস্ত থাকেন, তবে অন্যকে তাঁহার মত গ্রহণ করিতে বলার অধিকার তাঁহার নাই।

বসন্ত হইলে 'ভিজে চাদর চাপা' দেওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা। দিনে কম পক্ষে ইহা তিনবার প্রয়োগ করিবে। ইহাতে জ্বালা-যন্ত্রণা কমিবে, এবং যে সব গুটি বাহির হইয়াছে, তাহাও সারিয়া যাইবে।

ঘা থাকিলে তেল মলম ইত্যাদি লাগানর দরকার নাই। দু'এক জায়গায় ঘা থাকিলে, সম্ভব হইলে সেখানে পুলটিস্ বাঁধিবে। ক্ষুধা অনুসারে রোগীকে ভাত, লেবু, লঘুপাক ফল প্রভৃতি দিবে—খেঁজুর বাদাম প্রভৃতি গুরুপাক ফল খাইতে দিবে না। 'ভিজে চাদর চাপা' দিলে সপ্তাহ মধ্যে গুটি মরিয়া যাইবে; না মরিলে বুঝিতে হইবে শরীরের ভিতরকার বিষ বাহির হওয়া শেষ হয় নাই। বসন্তকে ভয়ঙ্কর ব্যারাম মনে করার কোনো হেতু নাই; বরং বসন্ত হইলে বুঝিতে হইবে যে, ইহা শরীরের বিষ স্বাভাবিক উপায়ে বাহির হইবার এবং পুনরায় স্বাস্থ্য-লাভের উপায় মাত্র।

বসন্ত সারিয়া গেলেও রোগী কিছুদিন দুর্ব্বল থাকে। অনেক রোগী পরেও অন্য অসুখে ভোগে। ইহা বসন্তের দোষ নয়; রোগ দূর করার জন্য যে চিকিৎসা করা হয়, ইহা সেই চিকিৎসারই দোষ। এইরূপ জ্বরে কুইনাইন ব্যবহার করিয়া অনেক সময় রোগী কালা হয়। কাহারও কানতালা লাগে, কেহ বা সংজ্ঞাশূন্য হয়। গম্ভীর ব্যারামে লোকে পারা প্রভৃতি খাইয়া নূতন রোগে আক্রান্ত হয়। জোলাপ লওয়ার ফলে কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর অর্শ হয়। এই সব উদাহরণ হইতে বুঝা যায়, ঔষধ ব্যবহারে রোগ তো সারেই না, বরং নূতন রোগ সৃষ্টি হয়। রোগ হইলে, কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা দূর করিবে এবং প্রকৃতির নিয়ম পালন করিয়া চলিবে। ইহা অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ কোনো ঔষধ নাই। ধাতু পুটপাক (পোড়াইয়া) করিয়া যে লৌহভস্ম প্রভৃতি তৈরী হয়, সেগুলিকে অমোঘ ঔষধ মনে করা হইলেও, তাহারা বাস্তবিক শরীরের মহা অনিষ্ট করে; কারণ শরীরের কিছু সাময়িক উপকার করিলেও ইন্দ্রিয়বিকার উৎপন্ন করে বলিয়া তাহারা মোটের উপর শরীর নষ্ট করে।

এই অধ্যায়ে বর্ণিত সহজ স্বাভাবিক ভাবে যদি বসন্তের চিকিৎসা করা হয়, তবে রোগও দূর হইবে এবং রোগীও পরে সুস্থ থাকিবে। একবার বসন্ত হইলে উহা আবার বড় হয় না।

বসন্ত সারিয়া যাওয়ার পরে গুটি শুকাইয়া গেলে রোগীর দেহে জলপাই তেল মালিস করা উচিত। রোগী যেন রোজ জলপাইতেল মাখিয়া স্নান করে। ইহাতে বসন্তের দাগ বিলকুল উঠিয়া যাইবে এবং নূতন চামড়া জন্মিবে।

—সপ্তম অধ্যায়—

অন্যান্য সংক্রামক রোগ

বসন্ত-রোগের ছোট বোন জল-বসন্ত ও হাম, প্লেগ, কলেরা, আমাশয়ও সংক্রামক রোগ। আমরা হাম ও জল-বসন্তকে ভয় করি না। কারণ ইহাতে মৃত্যু বড় হয় না, আর শরীরও কুৎসিৎ হয় না। ইহারা বসন্তের ন্যায় সংক্রামক। এই সব রোগে ঠাণ্ডা জলের চিকিৎসা এবং 'ভিজে চাদর চাপা' বিশেষ ফলপ্রদ। এই সব ব্যাধিতে খাদ্য খুব লঘুপাক ও সাদাসিধা হওয়া চাই। যদি টাট্‌কা ফল পথ্য করা যায়, তবে রোগ খুব দ্রুত সারিয়া যায়।

প্লেগ বড় ভয়ঙ্কর ব্যারাম। ইংরেজীতে ইহার পুরা নাম বিউ-বোনিক প্লেগ। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইহা ভারতে প্রথম দেখা দেয়। তখন হইতে লক্ষ লক্ষ লোকে এই রোগে মারা পড়িয়াছে। ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করিয়াও আজ পর্য্যন্ত ইহার কোনো উপযুক্ত ঔষধ বাহির করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমানে বসন্তের ন্যায় প্লেগেরও টীকা দেওয়া হয়। ইহাতে প্লেগ-জ্বরের প্রকোপ কমে। ডাক্তারগণ বুঝাইয়া থাকেন টীকা লইলে প্লেগ আর হইতে পারে না। বসন্তের টীকার ন্যায় ইহার টীকা লওয়াও পাপজনক। বসন্তের টীকা না লইলেই বসন্ত হইবে, ইহা যেমন বলা যায় না, তেমনি প্লেগের টীকা না লইলে প্লেগ হইবে এ কথাও কেহ জোর দিয়া বলিতে পারে না। আজ পর্য্যন্ত প্লেগের কোনো ঐষধ বাহির হয় নাই। নিশ্চিতরূপে

বলা যায় না যে, জল ও মাটির চিকিৎসায় উপকার হইবেই। যাঁহার মৃত্যু ভয় নাই, যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, নীচের প্রণালীতে তিনি চিকিৎসকিত হইতে পারেন ঃ—

(১) জ্বর আসিবার সময় অথবা জ্বর আসিবার কোনো লক্ষণ দেখিলেই শীঘ্র 'ভিজে চাদর চাপা' দিবে।

(২) গিঁটের উপর মাটির মোটা পুল্‌টিস বাঁধিবে।

(৩) রোগীকে মোটেই কিছু খাইতে দিবে না।

(৪) পিপাসা হইলে লেবুর রস ঠাণ্ডা জলে মিশাইয়া খাইতে দিবে।

(৫) রোগীকে পরিষ্কার ও খোলা হাওয়ায় শোয়াইবে।

(৬) রোগীর পাশে একজন ভিন্ন অপর কাহাকেও যাইবে দিবে না। কোনো চিকিৎসায় রোগীর আরোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে, এই চিকিৎসাতেও সে আরোগ্য হইবে।

প্লেগের উৎপত্তির নিশ্চিত কারণ এখনও স্থির হয় নাই। অনেকের মত এই যে, ইহা ইন্দুর দ্বারা বিস্তৃত হয়। কথাটা মিথ্যা নহে। যেখানে প্লেগ হয়, সেখানে যে ঘরে ইন্দুর থাকে সেই ঘর পরিষ্কার করা খুব দরকার; খাদ্য প্রভৃতি এ ভাবে ঢাকিয়া রাখা চাই, যেন ইন্দুর তাহা খাইতে না পায়, এমন কি নিকটেও যাইতে না পারে। ইন্দুরের গর্ত্ত প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দিবে। যে ঘর হইতে ইন্দুর দূর করা যায় না সেই ঘর ত্যাগ করিবে।

পরন্তু প্লেগ হইতে মুক্ত হইবার সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম উপায় হইল, প্রথম হইতেই পরিষ্কার এবং ভাল খাদ্য খাওয়া, মিতাহারী হওয়া, ব্যসন ত্যাগ করা, ব্যায়াম করা, খোলা হাওয়ায় থাকা, ঘর বাড়ী সাফ রাখা, মন্দ অভ্যাস ত্যাগ করা এবং সরল ও পবিত্র জীবন যাপন করা। সর্ব্বদাই আমাদের এই ভাবে চলা উচিত; কিন্তু অন্য

সময় সক্ষম না হইলেও, অন্ততঃ পক্ষে প্লেগের সময় আমাদের বেশী সাবধান হওয়া উচিত।

নিউমোনিক প্লেগ বিউবোনিক প্লেগ অপেক্ষা বেশী ভয়ঙ্কর এবং ইহা আরও শীঘ্র লোককে আক্রমণ করে। ইহাতে রোগীর শ্বাস লইতে বিশেষ কষ্ট হয়, জ্বর খুব বেশী হয় এবং রোগী প্রায়ই বেহুঁস থাকে। এই রোগ হইলে লোকে কদাচিৎ বাঁচে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জোহান্নিসবার্গে এই প্রকার প্লেগ দেখা দেয়। ২৩ জন রোগীর কেবল একজন বাঁচিয়াছিল। ইহার কিছু বিবরণ প্রথমে দিয়াছি। প্লেগের যে চিকিৎসার কথা বলিয়াছি, এ রোগেও সেই প্রণালীতে চিকিৎসা করিতে হইবে। পার্থক্য কেবল এই, ইহাতে মাটির পুল্‌টিস বুকের ছাতির দুই দিকে বাঁধা চাই। 'ভিজে চাদর চাপা' দেওয়ার সময় না থাকিলে, রোগীর মাথায় মাটির পাতলা পুলটিস দিবে। বলাবাহুল্য এ রোগেও চিকিৎসা অপেক্ষা যাহাতে ইহা মোটেই না হয় পূর্ব্ব হইতেই তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

কলেরাকে আমরা খুব ভয়ঙ্কর মনে করি; কিন্তু আসলে ইহা প্লেগ অপেক্ষা কম মারাত্মক। ইহাতে 'ভিজে চাদর চাপায়' কোনো কাজ দেয় না। কারণ এই রোগে শরীর ও পায়ে খিল ধরে। এ সময় পেটের উপর মাটির পুলটিস দিবে এবং যেখানে খিল ধরে সেখানে গরম জলের বোতলের সেঁক দিবে। রোগীর পা প্রভৃতি সরিষার তেল দিয়া মালিশ করিবে। তাহাকে কিছুই খাইতে দিবে না। রোগীকে সব সময় সাহস দিবে, সে যেন কখনও না ঘাবড়ায়। যদি ঘন ঘন দাস্ত হয়, তবে তাহাকে বার বার খাট হইতে নামাইবে না, বিছানার উপরই একটি বেড-প্যান বা সামান্য কাঁধা উঁচু পাত্র রাখিয়া তাহাতেই মলত্যাগ করাইবে। রোগের সুরু হইতেই

এইরূপ চিকিৎসা হইলে, রোগীর কষ্ট কম হইবে। কলেরার প্রাদুর্ভাব হইলে তাহা হইতে মুক্ত হইবার উত্তম উপায় আছে। এই ব্যারাম প্রায়ই গরমের সময় হয়। গরমের সময় অনেক প্রকার ফল পাকে এবং সুস্বাদু বলিয়া আমরা খুব ফল খাই; কাঁচা পাকা কোনো রকম বাদ দি না। তা'ছাড়া রোজকার খাওয়া তো আছেই। এজন্য এই সব ফল আমাদের খুব ক্ষতি করে। আমাদের পেটের ব্যারাম প্রভৃতি কোনো না কোনো ব্যারাম থাকেই। ফলগুলি সহ্য না হইলে এবং শরীর রোগের অনুকূল থাকিলে কলেরা হয়। ইহা ভিন্ন গরমের দিনে শুকাইয়া গিয়া এবং অন্য কারণেও জল ময়লা হয়। ঐ জল আমরা সিদ্ধ না করিয়া এবং না ছাঁকিয়া খাই। রোগীর মল যেখানে সেখানে ফেলা হয় বলিয়া, মলের জীবাণু বাতাসের সহিত মিশিয়া রোগ বিস্তার করে। এ অবস্থায় আমাদের রোগ হইবে না কেন? প্রকৃতি আমাদের শরীর খুব মজবুত বানাইয়াছে। এ জন্য খারাপ জিনিষ খাইয়াও আমরা বাঁচিয়া থাকি। তাহা না হইলে, আমরা যে ভাবে চলি, তার ফলে আমাদের শীঘ্রই পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে হইত।

কলেরার সময় এই ক'টি বিষয়ে সাবধান থাকিবে। লঘুপাক খাদ্য কম পরিমাণে খাইবে। খুব দেখিয়া শুনিয়া ভাল ফল খাওয়া যাইতে পারে। লোভ অথবা স্বাদের বশীভূত হইয়া দাগী অথবা পচা আম প্রভৃতি ফল কখনও খাইবে না। পরিস্কার হাওয়ায় থাকিবে। জল সর্ব্বদা ফুটাইয়া মোটা সাফ কাপড়ে ছাঁকিয়া খাইবে। রোগীর মল গর্ত্তে ফেলিয়া তার উপর শুকনা মাটি বেশী করিয়া চাপা দিবে। প্রত্যেকে পায়খানায় গিয়া মলের উপর ছাই অথবা শুকনা মাটির গুঁড়া ফেলিলে, রোগের ভয় অনেকাংশে কমিবে। বাস্তবিক এই নিয়ম সব সময় পালন

করা দরকার। বিড়াল পর্য্যন্ত থাবা দিয়া মাটীতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া পায়খানা করে এবং খোঁড়া মাটি দিয়া উহা ঢাকিয়া দেয়। পরন্তু আমরা শুচিবায়ু অথবা ঘৃণার জন্য এরূপ করি না এবং এই প্রকারে রোগ বিস্তারে সাহায্য করি।

আমাশয় সর্ব্বাপেক্ষা কম ভয়ানক সংক্রামক রোগ। আমাশয় হইলে তলপেটে যদি মাটীর পুলটিস ঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় এবং রোগীকে মোটেই কোনো খাদ্য না দেওয়া যায়, তবে ইহা খুব শীঘ্র সারিয়া যায়। রোগীর মল উপরে লেখা রীতিতে মাটীতে গাড়িয়া ফেলা আবশ্যক। জল সম্বন্ধেও কলেরার মত সাবধানে থাকিবে।

শেষকালে বলিতে চাই উপরে লিখিত সংক্রামক রোগ হইলে, রোগী তাহার সাথী এবং আত্মীয় স্বজন যেন সাহস না ছাড়েন। ভয়ে ঘাবড়াইলে রোগী শীঘ্র মরিয়া যাইতে পারে এবং তাহার আশেপাশে যাহারা থাকে সে সব বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনেরও ব্যারাম হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

—অষ্টম অধ্যায়—

প্রসব

কয়েকটি সাধারণ রোগ যে একই কারণে উৎপন্ন হয় এবং তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী যে একই প্রকার, তাহা পূর্ব্বে বুঝান হইয়াছে। আমরা বেশ জানি, যাহারা অনবরত রোগে ভুগিতেছেন এবং সর্ব্বদা মৃত্যুভয়ে ভীত, চিকিৎসার বিরুদ্ধে আমরা যতই বলি না কেন, তাহারা ডাক্তার কবিরাজের নিকট না গিয়া ছাড়িবেন না। আমাদের এ বিশ্বাসও আছে যে, এমন লোকও কিছু আছেন যাহারা, পুনরায় যাহাতে ভয়ঙ্কর ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতে না হয়, সেজন্য স্বাভাবিক নিয়মে রোগমুক্ত হইতে চান। তাহারা এই পুস্তকে প্রদত্ত স্বাস্থ্যের সরল নিয়ম পাঠে উপকৃত হইবেন। বই শেষ করার পূর্ব্বে মাতৃত্ব, শিশু-পালন ও কতিপয় আকস্মিক বিপদ সম্বন্ধে কিছু বলিব।

মনুষ্যেতর জীবের মধ্যে প্রসব বেদনা মোটেই নাই। সম্পূর্ণ সুস্থ স্ত্রীলোকদেরও এরূপ হওয়া উচিত। বাস্তবিক গ্রামের অধিকাংশ স্ত্রীলোক সন্তান প্রসবকে একটি মামুলী ব্যাপার মনে করেন; তাঁহারা প্রসবের প্রায় পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সংসারের কাজকর্ম্ম করিয়া থাকেন, এবং প্রসবকালে তাঁহাদের বিশেষ কোনো কষ্ট হয় না। যাহারা মজুরী করিয়া খায় এরূপ স্ত্রীলোক প্রসবের পরই কাজ করিতে আরম্ভ করে দেখা যায়।

তবে শহরের স্ত্রীলোকদের প্রসবকালে কেন এত দুঃখকষ্ট, এত অসহ্য বেদনা সহ্য করিতে হয়? সন্তান জন্মের পূর্ব্বে এবং পরে কেন তাহাদের এত সাবধানে রাখিতে হয়?

ইহার উত্তর খুব সোজা। শহরের মেয়েদের চালচলন সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। তাহাদের খোরাক, পোষাক প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ। ইহা ভিন্ন, আর একটি প্রধান কারণ আছে, তাহারা অল্প বয়সে গর্ভবতী হয়; এবং গর্ভধারণের পরেও এবং সন্তান জন্মের পর প্রসব শয্যা হইতে উঠিতে না উঠিতেই তাহাদের পুরুষের ইন্দ্রিয়লালসা পরিতৃপ্ত করিতে হয়, সে জন্য অল্পদিনের মধ্যে আবার তাহাদের গর্ভবতী হইতে হয়। ফলে লক্ষ লক্ষ বালিকা ও যুবতীর অবস্থা এইরূপ করুণ ও শোচনীয়। আমার মতে এইরূপ শহুরে জীবন আর নরকের ভিতর কোনো পার্থক্য নাই। পুরুষ যতদিন এরূপ রাক্ষসের ন্যায় ব্যবহার করিবে, ততদিন নারীর কোনো সুখশান্তির আশা নাই। অনেক পুরুষ স্ত্রীলোকের ঘাড়ে দোষ চাপান; কিন্তু কার দোষ বেশী, তাহা আলোচনা করার উদ্দেশ্য আমাদের নাই। দোষ যে আছে তাহা ঠিক এবং তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করাই আমাদের কাজ। প্রত্যেক বিবাহিত ব্যক্তির মনে রাখিতে হইবে, যতদিন অপরিণত বয়সে, গর্ভসঞ্চারের পর এবং প্রসবের অব্যবহিত পরে বিষয়ভোগ তৃষ্ণা সংযত করা না যাইবে, ততদিন সুখে প্রসব হইতে পারে না। প্রসবের সাধারণ কষ্ট স্ত্রীলোকে এই বিশ্বাসে সহ্য করে যে, প্রসবকালে তো বেদনা হয় আর একমাস বা দেড়মাস পর্য্যন্ত দুর্ব্বল থাকিতেই হয়। পরন্তু এ বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান না থাকার জন্য, তাহাদের সন্তান-সন্ততি দিন দিন দুর্ব্বল, অজ্ঞান ও নিস্তেজ হয়। এই ভয়ানক বিপদ দূর করার জন্য প্রত্যেকের আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। যদি একজন স্ত্রী এবং একজন পুরুষও এই অনাচার

ত্যাগ করে তবে জগতের কল্যাণ হইবে। এ বিষয়ে অপরে কি করিল তাহা দেখার দরকার নাই।

স্ত্রীর গর্ভসঞ্চারের পর হইতে স্বামীর প্রথম কর্ত্তব্য স্ত্রী-সহবাস না করা। ইহার পরের নয় মাস স্ত্রীর দায়িত্ব খুব বেশী; তাঁহার বুঝা উচিত তাঁহার এই সময়ের চালচলনের উপর ভাবী সন্তানের চরিত্র নির্ভর করিতেছে। মায়ের হৃদয় প্রেমপূর্ণ হইলে হইলে শিশুও প্রেমিক হইবে; মা ক্রোধী হইলে, শিশুও ক্রোধী হইবে। সুতরাং এই নয় মাস মাতার মনোবৃত্তি খুব ভাল থাকা চাই। এই সময় তিনি সর্ব্বদা পবিত্র কাজে নিযুক্ত থাকিবেন; কখনও রাগ করিবেন না। তিনি উদার চরিত্র, নিশ্চিন্ত, নির্ভিক হইবেন। তিনি আপনার হৃদয়ে আসুরীভাব আসিতে দিবেন না, মিথ্যা বলিবেন না এবং বাজে কথায় সময় নষ্ট করিবেন না। যে নারী এই সব নিয়ম পালন করেন, তাহার সন্তান তেজস্বী না হইয়া পারে না।

গর্ভবতী স্ত্রী মনের ন্যায় শরীরকেও পবিত্র রাখিবেন। প্রচুর পরিষ্কার হাওয়া সেবন করা এবং পুষ্টিকর লঘুপাক খাদ্য পরিমিত পরিমাণে তাঁহার খাওয়া উচিত। তিনি যতটা হজম করিতে পারেন ততটা গমের প্রস্তুত জিনিষ ও জলপাইএর তেল তাঁহাকে খাইতে দেওয়া উচিত। কোষ্ঠবদ্ধ হইলে জলপাই তেলের মাত্রা বাড়াইয়া দিবে। কোনো ঔষধ খাইতে দিবে না। শরীর অস্থির হইলে ও বমি হইবে মনে হইলে চিনি না দিয়া লেবুর রস জলে মিশাইয়া খাওয়াইবে। এই নয় মাস লঙ্কা, মসলা ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিবে।

অনেক স্ত্রীলোকের এই সময় নানা রকম জিনিষ খাইবার ইচ্ছা হয়। 'কুনের স্নানে' ইহা দূর হইবে। এই স্নানে দেহের শক্তি ও কান্তি বৃদ্ধি হয় এবং প্রসব বেদনা কমে। এই সময় মনের উপর অঙ্কুশও রাখা

দরকার। যে সব জিনিষ খাইবার ইচ্ছা হইবে দু' এক বার ত্যাগ করিলে তাহার কথা মনেই পড়িবে না—ইচ্ছাকে অঙ্কুরে দমন করিতে চেষ্টা করিলে তাহা দমন করা সহজ। গর্ভস্থ শিশুর কল্যাণের কথা যেন মাতাপিতার সর্ব্বদা মনে থাকে।

স্বামী যেন এই সময় স্ত্রীর সহিত ঝগড়া-ফ্যাসাদ বাধাইয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত না করেন। তিনি এমন ভাবে চলিবেন যাহাতে স্ত্রী সন্তুষ্ট ও সুখী থাকেন। সংসারের শ্রমসাধ্য কাজগুলি তাঁহার করা উচিত নয় এবং রোজ কিছু সময় খোলা হাওয়ায় তাঁহার বেড়ান দরকার। কোনো অবস্থায় তাঁহাকে কোনো ঔষধপত্র দিবে না।

—নবম অধ্যায়—

শিশু-পালন

ধাত্রীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এখানে কিছু লিখিব না। শিশুর জন্মের পর কি করা দরকার, তাহাই আলোচনা করিব। পূর্ব্ব অধ্যায় যিনি পড়িয়াছেন, তিনি বুঝিবেন যে, প্রসূতির জন্য অন্ধকার কুঠরী, দুর্গন্ধ বিছানা আর বন্ধ ঘর দরকার নাই। তাঁহার খাটের নীচে আগুনের পাত্র রাখিয়া তাঁহাকে ঝলসাইয়া দিবারও কোনো প্রয়োজন নাই। অন্ধকার ঘরে প্রসূতিকে রাখার রেওয়াজ যতই পুরাতন হউক না কেন, তাহা খুব অনিষ্টকর। তাঁহাকে বন্ধ ঘরে রাখিলে আরও বেশী ক্ষতি হয়। শীতের সময় প্রসূতির গরম বিশেষ দরকার। এ জন্য তাঁহাকে খুব গরম পোশাক পরাইবে। কুঠরীতে যদি বেশী ঠাণ্ডা থাকে তবে হাওয়া গরম করার জন্য আগুন রাখা যাইতে পারে; কিন্তু আগুন বাহিরে ধরাইয়া ধুঁয়া সম্পূর্ণরূপে দূর হইলে উহা ঘরে লইবে। আগুনের পাত্র বা মালসা কখনও খাটের নীচে রাখিবে না। বিছানায় গরম জলের বোতল রাখিয়াও প্রসূতিকে গরম করা যাইতে পারে। প্রসূতিকে ময়লা ও দুর্গন্ধ কাপড়চোপড় পরানর প্রথাও সর্ব্বনেশে ও ভ্রমপূর্ণ। প্রসবের সময়কার সব কাপড় ভাল করিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া ব্যবহার করিবে।

শিশুর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে মায়ের স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। এজন্য উপরে লেখা সতর্কতা অবলম্বন ছাড়া মাকে এমন সব হিতকর খাদ্য দিবে যাহা তাঁহার স্বাস্থ্যের অনুকূল। প্রসূতিকে গমের প্রস্তুত খাদ্য,

কলা ইত্যাদি ফল, জলপাইএর তেল খাওয়াইলে তাঁহার শরীর গরম থাকিবে এবং স্তনে প্রচুর দুধ হইবে। জলপাইএর তেল খাইলে মায়ের দুধ জোলাপের কাজও করিবে এবং শিশুর দাস্ত খোলসা হইবে। শিশুর শরীরে কোনো রোগ দেখা দিলে শীঘ্রই মায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা চাই; শিশুকে ঔষধ দেওয়া আর তাহাকে হারাণ এক কথা। শিশুর পাকাশয় অত্যন্ত কোমল, এ জন্য ঔষধ প্রভৃতি তাহার পক্ষে বিষের ন্যায় কাজ করে। এ সময় ঔষধ দিতে হইলে, মাতাকে দিবে, কারণ ঔষধের গুণ সূক্ষ্মরূপে মায়ের স্তনদুগ্ধে থাকিবে। শিশুর কাশি অথবা দাস্ত হইলে ভয় পাইবে না। দু এক দিন দেখিয়া তাহার কারণ খুঁজিয়া তাহা দূর করা চাই। এরূপে রোগ সারিয়া যাইবে। মিছামিছি ব্যস্ত হইয়া ঔষধ দিলে শিশুর শরীর নিশ্চয় খারাপ হইবে।

শিশুকে অল্প গরম জলে স্নান করাইবে তাহাকে যথাসম্ভব কম কাপড় পরাইবে। কয়েক মাস পর্য্যন্ত কাপড় না পরানই আরও ভাল। ছোট একখানা নরম সূতার চাদর গায়ে জড়াইয়া তার উপরে গরম কাপড় দিয়া শিশুকে শোয়াইবে। ইহাতে জামা ইত্যাদি পরাইতে হইবে না, কাপড় কম ময়লা হইবে, তার শরীর নরম না হইয়া শক্ত হইবে। নাভির উপর পাতলা কাপড় চার ভাঁজ করিয়া রাখিয়া তাহার উপর পট্টী বাঁধিয়া দিবে, যেন তাহা কোনো দিকে সরিয়া না যায়। নাড়ীতে দড়ি বাঁধিয়া তাহা গলার উপর হইতে ঝুলাইয়া দেওয়া বড় খারাপ। নাভির উপরের পট্টী সদাসর্ব্বদা খুলিবে। নাভির আশেপাশের অংশ যদি ভিজা দেখা যায়, তবে পরিষ্কার চালুনীতে ছাঁকা সূক্ষ্ম আটা তুলায় লাগাইয়া সেখানে লাগাইবে, ইহাতে ভিজা স্থান শুকাইয়া যাইবে।

মায়ের স্তনে খুব দুধ থাকিলে শিশুকে অপর কোনো খাদ্য দেওয়ার

দরকার নাই। দুধ কম হইলে গম সেঁকিয়া গুঁড়া করিবে এবং অল্প গুড় ও জল মিশাইয়া শিশুকে খাওয়াইবে। ইহাতে দুধের কাজ হইবে। আধখানা কলা, আধ চামচ জলপাই তেলে মিশাইয়া খাওয়াইলেও বেশ উপকার হয়। গরুর দুধ খাওয়াইতে হইলে এক ভাগ দুধে, তিন ভাগ পরিষ্কার জল মিশাইয়া একবার উতলাইয়া নামাইবে, তখন ইহাতে অল্প গুড় দিবে। গুড়ের বদলে চিনি দিলে ক্ষতি হয়। যদি টাটকা ফল শিশুকে ক্রমে বেশী পরিমাণে খাওয়ান যায়, তবে তাহার রক্ত শুদ্ধ হইবে—এবং সে তেজস্বী ও বলবান হইবে। যে মাতা দাঁত উঠার পূর্ব্বে অথবা দাঁত উঠা মাত্রই শিশুকে ডাল, ভাত ও তরিতরকারী খাওয়ান তিনি শিশুর মহা অনিষ্ট করেন। শিশুকে কখনও চা-কফি খাওয়াইবে না।

শিশু বড় হইয়া চলা-ফেরা করিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে কুর্ত্তা ইত্যাদি পরাইবে। জুতার কোনো দরকার নাই। শিশুকে তো কাঁটা ইত্যাদির ভিতর চলিতে হয় না। খালি পায়ে থাকিলে তার পা মজবুত হইবে। জুতা পরাইলে রক্ত চলাচলে বাধা পড়ে, খালি পায়ে থাকিলে এরূপ হয় না। শোভা বৃদ্ধির জন্য রেশমী কাপড় বা জরীর কাপড়, মূল্যবান টুপী প্রভৃতি পরা নেহাইত বর্ব্বর ও সাংঘাতিক প্রথা। প্রকৃতিই মানুষকে যে সৌন্দর্য্য যে কান্তি দিয়াছে, তাহা আমরা বাড়াইতে পারি ইহা মনে করা মিথ্যা অভিমান ও মূর্খতার চিহ্ন। সর্ব্বদা মনে রাখিবে, শিশুর শিক্ষা জন্মকাল হইতেই আরম্ভ হয়। মাতা পিতাই তাহার সাচ্চা শিক্ষক। শিশুকে ধমকান, তার শরীরের উপর পোযাকের বোঝা চাপান, তাহাকে খুব ঠুসিয়া খাওয়ান শিক্ষার নীতিবিরুদ্ধ। খিটখিটে মা বাপের সহিত থাকিয়া শিশু খিটখিটে আর ঠাণ্ডা প্রকৃতির মা-বাপের কাছে থাকিয়া শিশু ঠাণ্ডা

প্রকৃতির হইবে। শিশুর কথাবার্ত্তা প্রভৃতি মা-বাপের কথাবার্ত্তা ইত্যাদির ন্যায় হইবে। মাতাপিতার শুদ্ধ উচ্চারণ শুনিয়া শিশু শুদ্ধ উচ্চারণ করিবে, তাহারা জড়াইয়া কথা বলিলে শিশুও জড়াইয়া কথা বলিবে। যদি তাহাদের মুখ দিয়া গালাগালি বাহির হয়, তবে শিশুও গালি দেওয়া শিখিবে। মা-বাপ নীতি-বিরুদ্ধ আচরণ করিলে, শিশুও তাহাই করিবে। মা-বাপ যাহা খাইবে যাহা পান করিবে, শিশুও তাহাই খাইতে তাহাই পান করিতে শিখিবে। এ কথাটি বিলকুল ঠিক—'যেমন বাপ তেমনি বেটা।' বাপের অর্থ একটু ব্যাপক করিয়া মা-বাপ দুজনকেই এখানে বুঝিতে হইবে। মোট কথা ঘরে বসিয়া মা-বাপের নিকট শিশু যেরূপ শিক্ষা পাইতে পারে, সেরূপ শিক্ষা আর কোথাও পাওয়া যায় না।

তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি, পিতামাতার দায়িত্ব কত গুরু। মানুষের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য এই যে, সে সদাচার শিক্ষা দিয়া সন্তানের চরিত্র এমনভাবে গঠন করিবে যে, সে নিজের ও পিতার শোভা বৃদ্ধি করে। কলাগাছে কলা হয়; যে গাছ ভাল, তারও ফলও ভাল লাগে। ভাল পশুর বাচ্চাও ভাল হয়। মানুষের ভিতর ইহার ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। তাই শুদ্ধস্বভাব মাতাপিতার সন্তানকে মন্দ প্রকৃতির এবং সুস্থ মাতাপিতার সন্তানকে অসুস্থ দেখা যায়। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, আমরা মা-বাপের উপযুক্ত না হইয়াই নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতার ফলে মা-বাপ হইয়া পড়ি। এ অবস্থায় কিরূপে শিশুর স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে? কিন্তু সন্তানকে সৎপথে চালনা করাই সদাচারী পিতামাতার কর্ত্তব্য। এজন্য মাতাপিতা উভয়েরই সুশিক্ষার প্রয়োজন। যাঁহারা এরূপ শিক্ষিত নহেন, এবং নিজেদের ত্রুটী যাঁহারা বুঝিতে পারেন, তাঁহারা যেন শিশুদিগকে চরিত্রবান্ সুশিক্ষিত লোকের হাতে

সঁপিয়া দেন। স্কুলে পাঠাইলেই, তাহারা সচ্চরিত্র হইবে, এরূপ আশা করা ভুল। সর্ব্বদা সৎসঙ্গে রাখাই তাহাদের চরিত্রগঠনের একমাত্র উপায়। বিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত ঘরের শিক্ষার সামঞ্জস্য না থাকিলে শিশু কখনও উন্নত হইবে না।

শিশুর প্রকৃত শিক্ষা জন্মের পর হইতেই আরম্ভ হয়। তখন হইতেই তাহার শারীরিক, মানসিক ব্যবহারিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শিক্ষা সুরু হয়। আধ আধ বুলি বাহির হওয়ার সহিত তাহার শব্দজ্ঞান সুরু হয়। মা-বাপের নিকট হইতে সে খেলার ছলে অক্ষরজ্ঞান লাভকরিতে পারে পূর্ব্বে এই রূপেই তার অক্ষরপরিচয় হইত। শিশুকে পাঠশালায় পাঠাই-বার রীতি তো আধুনিক। মাতাপিতা শিশুর প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিলে, শিশুর উন্নতির সীমা নির্দ্দেশ করা যাইত না। কিন্তু আমরা তো শিশুদিগকে খেলার পুতুল করিয়া রাখি, সুন্দর কাপড়চোপড় গহনা ইত্যাদি পরাই, মিঠাই খাওয়াই এবং মিথ্যা আদর যত্ন করিয়া শিশুকাল হইতেই তাহাদের বিগড়াইয়া দি; মিথ্যা স্নেহের বশে তাহাদের যাহা খুসী করিতে দি। আমরা নিজেরা লোভী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অলস, নোংরা, মিথ্যাবাদী, স্বার্থপর; আমাদের দৃষ্টান্তে আমাদের সন্তান-সন্ততি যে এইরূপ হইবে ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। প্রত্যেক মা-বাপের ইহা ভাবিয়া দেখা উচিত, কারণ তাহাদের উপরই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

—দশম অধ্যায়—

কতকগুলি আকস্মিক বিপদ

জলে ডোবা

নানা রোগের কথা আলোচনা করা হইল। এখন কতকগুলি আকস্মিক বিপদ ও তাহাদের প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এ বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান সকলের থাকা উচিত, ইহাতে কাহারও জীবন বিপন্ন হইলে সাহায্য করা যায়। শৈশবকাল হইতে বালকদের এরূপ শিক্ষা দিলে, তাহাদের দয়াবৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং দায়িত্বজ্ঞানও বৃদ্ধি পায়।

প্রথমেই আমরা জলমগ্ন ব্যক্তির কথা বলিব। বাতাস না পাইলে মানুষ পাচ মিনিটের বেশী বাঁচিয়া থাকিতে পারে না; সুতরাং জল হইতে তোলার পর জলে-ডোবা মানুষের প্রাণ অতি সামান্যই থাকে। যাহাতে তাহার প্রাণরক্ষা হয়, সে জন্য দ্রুত বন্দোবস্ত করা দরকার। এ জন্য দুটী কাজ বিশেষভাবে করিতে হইবে—কৃত্রিম উপায়ে রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস লওয়ান এবং তাহার শরীর গরম করা। প্রতিকারের কথা চিন্তা করার সময় আমরা যেন না ভুলি যে, এইরূপ ব্যক্তির চিকিৎসা এমন সব নদী অথবা পুষ্করিণীর কিনারায় তাড়াতাড়ি করিতে হয়, যেখানে সব জিনিষ মিলে না। জলে-ডোবা মানুষের কাছে দুই তিন জন লোক থাকিলে, তাহার ঠিকমত চিকিৎসা চলিতে পারে। এ সময় যাহারা সাহায্য করিবে, তাহাদের ক্ষিপ্রতা, ধৈর্য্য ও স্ফূর্ত্তির

সহিত কাজ করা চাই। তাহারা যদি ঐ সময় ঘাব্ড়াইয়া যায়, তবে তাহাদের দ্বারা কোনো কাজ হইবে না। আর এক কথা, এই দুই তিন জনের প্রত্যেকে যদি যার যার ইচ্ছামত চিকিৎসা স্থরু করে, অথবা একে অপরকে পরামর্শ দিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলেও রোগীকে বাঁচান কঠিন হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা চতুর লোকের পরামর্শমত অন্যের কাজ করা উচিত।

লোকটাকে জল হইতে উঠাইয়াই তাহার ভিজা কাপড় ছাড়াইয়া নিজেদের কাছের কাপড় দিয়া তাহার গা মুছাইয়া দিবে। তাহার পর তাহার হাত তাহার কপালের নীচে রাখিয়া এক মিনিট পর্য্যন্ত তাহাকে উপুড় করিয়া শোয়াইবে। পরে তার বুকের নীচে হাত রাখিয়া মুখ হইতে জল থুথু ইত্যাদি বাহির করিয়া ফেলিবে। এইরূপ করার সময় জিহ্বা বাহির হইয়া আসিবে; তখন রুমাল দিয়া জিহ্বা ধরিবে এবং যতক্ষণ তাহার জ্ঞান না হইবে, ততক্ষণ জিহ্বা বাহিরে রাখিবে। তারপর তাহাকে চিৎ করিয়া শোয়াইবে, কিন্তু মাথা ও বুক পায়ের চেয়ে যেন কিছু উপরে থাকে। তখন একজন হাঁটু গাড়িয়া রোগীর মাথার পিছনে বসিয়া তাহার দুই হাত ধীরে ধীরে সোজাভাবে লম্বা এবং সিধা করিবে। ইহা করিলে পাঁজরা উঁচু হইবে আর বাহিরের হাওয়া শরীরের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিবে। পরে তাহার হাত গুটাইয়া তার বুকের উপর নামাইবে, ইহাতে পাঁজরা নীচু হইয়া শ্বাস বাহিরে যাইতে স্থরু করিবে। ইহা ছাড়া গরম ও ঠাণ্ডা জল হাতে লইয়া রোগীর বুকে ছিটাইতে থাকিবে। আগুনের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে আগুনের সেঁক দিয়া তাহার শরীর গরম করিবে। নিকটে যাহারা থাকিবে তাহারা নিজেদের সব কাপড় যেন রোগীর গায়ে জড়াইয়া দেন ও শরীর গরম করার জন্য ঘসেন। আশা ত্যাগ না করিয়া

চিকিৎসা করিবে। ডাক্তার বেরিংগ লিখিয়াছেন, কখনও কখনও এই সব চিকিৎসা করার পাচ ছয় ঘণ্টা পর রোগীর শ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছে। এজন্য উপরের কাজগুলি খুব তৎপরতার সহিত করা চাই। রোগীর কিছু জ্ঞান হইয়াছে মনে হইলে, তাহাকে কিছু গরম জিনিষ পান করাইবে। কমলালেবুর রস গরম জলে দিয়া বা দারুচিনি, লবঙ্গ অথবা গোলমরিচের ক্বাথ করিয়া খাওয়াইলে বিশেষ উপকার করিবে। তাহাকে তামাক শোঁকাইলেও উপকার হইতে পারে। তাহাকে এই সময় অনর্থক ঘিরিয়া থাকিবে না। খোলা হাওয়া তাহার যত জোটে ততই ভাল।

জলমগ্ন ব্যক্তির মরার সাধারণ চিহ্ন এই ঃ—তাহার শ্বাস বন্ধ হওয়া, বুকের উপর হাত অথবা নল রাখিলে কোন শব্দ না পাওয়া, নাড়ির গতি বন্ধ হওয়া, চোখ আধ-খোলা থাকা, চোখের পাতা ভারী হওয়া, দাঁতে দাত লাগিয়া যাওয়া, আঙ্গুল বাঁকা হওয়া, দাতের ভিতর দিয়া জিহ্বা বাহিরে আসা, মুখে ফেনা উঠা, নাক লাল হওয়া, সারা শরীর ফ্যাকাশে মনে হওয়া, নাকের কাছে ময়ূরের পালক রাখিলে তাহা একটুও না নড়া, নাকের নিকট কাচ রাখিলে, তাহাতে একটুও ভাপ না জমা—এই সব চিহ্ন একসাথে থাকিলে বুঝিবে রোগী মরিয়াছে। পরন্তু ডাক্তার মুর কহিয়াছেন, এই সব চিহ্ন থাকা সত্ত্বে কয়েকবার দেখা গিয়াছে যে, শরীর হইতে প্রাণ বাহির হয় নাই। শরীর পচিতে আরম্ভ করিলে বুঝিবে নিশ্চয়ই প্রাণ বাহির হইয়াছে। জলে-ডোবা ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা অনেকক্ষণ করার পর যেন আমরা তাহার জীবনের আশা ছাড়ি।

আগুনে পোড়া

কখনও কাহারও কাপড়চোপড়ে আগুন ধরিলে আমরা ঘাবড়াইয়া যাই, এবং তাহার সাহায্য করিতে গিয়া অজ্ঞতার জন্য আরও অনিষ্ট করি। এরূপ অবস্থায় আমাদের কি করা কর্ত্তব্য তাহা আমাদের জানা দরকার।

যাহার কাপড়ে আগুন লাগে সে যেন না ঘাবড়ায়। যদি কাপড়ের এক কোণ জ্বলিয়া উঠে, তবে শীঘ্র হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া তাহা নিবাইয়া ফেলিবে। সমস্তটা জ্বলিয়া উঠিলে ধূলায় গড়াগড়ি দিবে। সতরঞ্চি অথবা ঐরূপ মোটা কোনো কাপড় পাইলে তাহা দিয়া শরীর জড়াইবে; জল পাওয়া গেলে ঐ কাপড়ের উপর জল ঢালিয়া আগুন নিবাইবে। আগুন নিবিলে শরীরের কোনো অংশ পুড়িয়াছে কি না দেখিবে। পোড়া যায়গায় কাপড় লাগিয়া থাকিলে, ঐ কাপড় টানিয়া উঠাইবে না; কাপড় কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলিবে। খুব সাবধানে কাটিবে, যেন চামড়া না উঠিয়া যায়। পরে চটপট পরিষ্কার মাটি লইয়া ঠাণ্ডা জলে গুলিয়া পোড়া যায়গায় তাহার পুলটিস বাঁধিয়া দিবে; ইহাতে জ্বালা শীঘ্র দূর হইবে, এবং রোগী খুব কম কষ্ট পাইবে। কাপড় চামড়ার সহিত লাগিয়া থাকিলেও তাহার উপর পট্টী বাঁধায় কোনো ক্ষতি হইবে না। পট্টী শুকাইয়া গেলে তাহা বদলাইয়া দিবে; ঠাণ্ডা জল লাগানর কোনো ভয় নাই।

যেখানে এই উপায় অবলম্বন করা সম্ভব নয়, সেখানে নীচে বর্ণিত ঔষধটি দিলে অনেক উপকার হইবে। কলার সবুজ পাতার উপর জলপাইএর তেল অথবা তিল, সরিষা বা নারিকেলের তেল ভাল করিয়া লাগাইয়া পোড়া স্থানে বাঁধিয়া দিবে। পাতার পরিবর্ত্তে পরিষ্কার সূক্ষ্ম

কাপড় তেলে ভিজাইয়া বাঁধিয়া দিলেও চলিবে। তিসির তেল এবং চুনের জল সমান ভাগে লইয়া খুব ফেনাইয়া লাগাইলে উপকার হইবে। যে কাপড় আঁটিয়া গিয়াছে, তাহা বাহির করা না গেলে অল্প গরম দুধ এবং জল দিয়া খুব ভিজাইয়া ধীরে ধীরে তুলিয়া ফেলিবে। প্রথম বার বাঁধা তেলের পট্টী দুই দিন পরে খুলিবে। পরে হামেশা পট্টী বদলাইবে। ফোস্কা উঠিয়া থাকে তো তাহা ফুটা করিয়া দিবে, কিন্তু চামড়া কখনও ছিড়িয়া ফেলিবে না।

পোড়ার জন্য যদি কেবল চামড়া লাল হইয়া থাকে তবে তাহার উপর মাটির পট্টী বাঁধা অপেক্ষা অপর কোনো ভাল চিকিৎসা নাই। ইহা বাঁধা মাত্র জ্বালা বন্ধ হইবে।

আঙুল পুড়িলে পরিষ্কার পট্টী বাঁধিবে এবং লক্ষ্য রাখিবে যে, এক আঙুলের সাথে যেন অন্য আঙুল ঘসা না লাগে। এসিড লাগিয়া চামড়া পুড়িলেও এই উপায়ে চিকিৎসা করিবে।

সাপের কামড়

মানুষ সর্ব্বদা সাপের ভয় করে। সাপ সম্বন্ধে যে কত ভুল ধারণা লোকের আছে, তাহার অন্ত নাই। সাপের নাম নিতেই আমরা ভয় পাই। রাত্রিকালে 'সাপ' শব্দটী আমরা উচ্চারণও করি না। হিন্দুদের মধ্যে সাপের পূজা হয়; নাগ-পঞ্চমীর দিন সাপ-পূজার জন্য বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট আছে। অধিকাংশ হিন্দু মনে করে, শেষনাগ পৃথিবী ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং ভগবান শেষনাগের উপর শয়ন করিয়া আছেন। শিবের গলায় সাপের হাড়ের মালা কল্পনা করা হইয়াছে। 'সহস্রমুখ শেষনাগও ইহা বর্ণনা করিতে অক্ষম'—এ কথায় বুঝাইতেছে যে সাপের বুদ্ধি ও জ্ঞান আছে বলিয়া আমরা ধরিয়া লইয়াছি। কর্কটক নাগ নল রাজাকে দংশন করিয়া তাঁহার বড় উপকার করিয়াছিল; সাপের বিষের ক্রিয়ায় তিনি কদাকার হইয়াছিলেন; ইহাতে আত্মগোপন করার পক্ষে তাঁহার সুবিধা হইয়াছিল। খৃষ্টানদের ভিতর সাপ সম্বন্ধে এরূপ ধারণা আছে। ইংরেজীতে লোককে সাপের সমান বুদ্ধিমান ও ধূর্ত্ত বলা হয়। খৃষ্টানদের ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলে আছে, শয়তান সাপের মূর্ত্তি ধরিয়া হাওয়া বিবিকে (ইভকে) প্রলুব্ধ করিয়াছিল।

সাপের বিষয়ে অনেক কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে। সাপের ভয়ের কারণ সুস্পষ্ট। সাপের বিষ শরীরের ভিতর ছড়াইয়া পড়িলে মৃত্যু নিশ্চিত। মৃত্যুভয়ে অতিমাত্রায় ভীত বলিয়া আমরা সাপকে এত ভয় করি; মনে হয় ভয়ই সাপের পূজার কারণ। কিন্তু সাপ যদি কীটপতঙ্গের মত খুব ছোট জন্তু হইত, তবে এত ভয়ঙ্কর হওয়া সত্ত্বে পূজিত হইত না; ইহা আকারে বড়, সুন্দর ও বিচিত্র; এজন্য ইহার পূজা চলিয়া আসিতেছে।

সাপের বুদ্ধি আছে কেন বলা হয় তাহা আলোচনা করা দরকার। আজকালকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, সাপের মোটেই বুদ্ধি নাই। তাহারা বলেন, দেখামাত্র সাপ মারিয়া ফেলিবে। গভর্ণমেণ্টের হিসাব অনুসারে সর্পদংশনে ভারতবর্ষে গড়ে প্রতিবৎসর ২০,০০০ লোক মরে। সম্ভবত ইহার চেয়ে বেশী লোক মরে। বিষাক্ত সাপ মারিলে গভর্ণমেণ্ট হইতে বকশিস দেওয়া হয়। ইহাতে ভারতের কিছু উপকার হইয়াছে কি না তাহা আলোচনা করিব। সকলেই জানেন যে, সাপ শুধু শুধু দংশন করে না, কোনোরূপে জ্বালাতন বা অত্যাচারিত হইলে প্রতিশোধ লইবার জন্য কামড়ায়। ইহা কি বুদ্ধির চিহ্ন নহে? যদি কেহ বলেন, ইহাও তাহার বুদ্ধির প্রমাণ নহে, তবে নিশ্চয়ই ইহা তাহার নির্দোষীতার প্রমাণ। নিজেকে বাঁচাইবার জন্য সে নিজের দাঁতকে কাজে লাগায়; মানুষও প্রায় ইহা করে। ভারতবর্ষ অথবা কোনো দেশকে সর্পহীন করার চেষ্টা, হাওয়ার সহিত যুদ্ধ করার সমান মনে হয়। কোনো বিশেষ স্থানে সাপের যাতায়াত বন্ধ করা যায়; আসার পর মারিয়া ফেলিলে অন্য সাপ সেখানে আসিতে আসিতে থামিয়া যাইবে। সে বুঝিবে ওখানে গেলে মৃত্যু ধ্রুব। কিন্তু ইহা অতি অল্প স্থানে করা সম্ভব। ভারতবর্ষের মত বড় দেশে এই প্রচেষ্টা কখনও সফল

হইতে পারে না, এখানে সাপ মারিয়া উচ্ছেদ করার চেষ্টা জলে পয়সা ফেলার সমান নিরর্থক।

যে ভগবান আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই সাপ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার সকল কাজ বুঝার শক্তি আমাদের নাই। কিন্তু আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারি যে, তিনি আমাদের ধ্বংসের জন্য সিংহ, বাঘ, সাপ ও বিছা প্রভৃতি সৃষ্টি করেন নাই। মানুষ সাপ দেখিলে প্রায়ই মারে; এ জন্য সাপেরা যদি একটি সভা করিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করে যে, তাহাদের ধ্বংসের জন্যই ভগবান মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, তবে কি আমরা ইহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিব? নিশ্চয়ই না। সাপকে মানুষের স্বাভাবিক শত্রু মনে করিয়া কিন্তু আমরা সেই একই ভুল করিতেছি।

য়ুরোপে সাধু ফ্রান্সিস নামে এক মহাযোগী ছিলেন। তিনি বনে-জঙ্গলে চলাফেরা করিতেন; কিন্তু সাপ অথবা অন্য কোনো বন্য জন্তু কখনও তাঁহার কোনো অনিষ্ট করে নাই, বরং তাহারা তাঁহার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিত। ভারতবর্ষের বনে হাজার হাজার যোগী ও ফকীর থাকেন। তাঁহারা চিতাবাঘ, বাঘ, সিংহ, সাপ প্রভৃতির ভিতর নির্ভয়ে বিচরণ করেন। এই সব প্রাণী তাঁহাদের কখনও ক্ষতি করিয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। তবে আপত্তি উঠিতে পারে, সাপ ও অন্যান্য হিংস্র জন্তু সাধু-সন্ন্যাসীদের ধ্বংস করে কি না, তাহা বন হইতে বহু দূরে বাস করিয়া আমরা কিরূপে জানিতে পারি? কিন্তু আমরা জানি, বনে সাপ ইত্যাদির সংখ্যা এত বেশী এবং তাহার অনুপাতে যোগী প্রভৃতির সংখ্যা এত কম যে, যদি ঐ সব হিংস্র জন্তু মানুষের শত্রুতা সাধন করিতে রত হয়, তবে সেখানে এক জন সাধুও জীবিত থাকিবেন না। আর ইহাও আমরা জানি যে, ঐ সব জন্তুরা

সহিত যুদ্ধ করার মতন কোনো অস্ত্র সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে থাকে না। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, আমরা যাহাদের খুব ভয়ঙ্কর মনে করি, এরূপ অনেক প্রাণী অসংখ্য সাধু-সন্ন্যাসীর সহিত বন্ধুভাবে বাস করে, তাহাদের দুঃখ দেয় না এবং নির্ভয়ে বিচরণ করিতে দেয়। আমি বিশ্বাস করি, আমরা কোনো জীবের প্রতি শত্রুভাব পোষণ না করিলে, তাহারাও আমাদের প্রতি শত্রু-ভাব পোষণ করিবে না। দয়া আর প্রেম মানুষের মহৎ গুণ। ইহা ভিন্ন কাহারও ঈশ্বরভক্তি হইতে পারে না। প্রেমই সকল ধর্ম্মের সার।

তাহা ছাড়া সাপ ইত্যাদির উৎপত্তি অথবা তাহাদের ক্রূর স্বভাব মানুষের স্বভাবের প্রতিধ্বনি মনে করি না কেন? মানুষের ভিতর কি অল্প ক্রূরতা রহিয়াছে? আমাদের জিহ্বা ত সর্ব্বদা সাপের বিষে ভরা থাকে। চিতাবাঘ ও সিংহের ন্যায় আমরা আমাদের ভাইদের ছিঁড়িয়া খাই। ধর্ম্মগ্রন্থে লেখা আছে নির্দোষ মানুষের প্রভাবে বাঘ এবং মেষ বন্ধুতা করে। যতক্ষণ আমাদের শরীরের ভিতর বাঘ ও মেষের যুদ্ধ চলিবে, ততদিন এই বহির্জগতেও যে যুদ্ধ চলিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? আমরা জগতের দর্পণস্বরূপ। জগতের সব ভাব আমাদের শরীর-জগতে বর্ত্তমান আছে। যদি আমরা এ গুলি বদলাইয়া ফেলি, তবে জগতের ভাবও যে বদলাইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি নিজের মনের ভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারে, জগৎ তাহার কাছে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ইহাই ভগবানের মহামায়া—তাঁহার লীলা, তাঁহার ঐশ্বর্য্য। আর ইহার ভিতরেই আমাদের সুখের মূল নিহিত আছে। এই পথ সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে, অপরের কার্য্য সমালোচনা না করিয়াই, নিজেদের কাজ দ্বারাই আমরা সব কিছু করিতে পারি।

সর্পদর্শন সম্বন্ধে এত বিস্তৃতভাবে লেখার কৈফিয়ৎ এই। শুধু সর্পদর্শনের চিকিৎসার উপায় নির্দ্দেশ করা অপেক্ষা আরও গভীরভাবে ইহা আলোচনা করার ইচ্ছা আমাদের ছিল এবং তদনুসারে সকল রকম অনর্থক ভয় হইতে মুক্ত হওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় সম্বন্ধে বলিয়াছি। একজন পাঠকও যদি উপরে লেখা প্রণালীতে রোগ দূর করিতে চেষ্টা করে, তবে এই সব কথা লেখা সার্থক মনে হইবে। আর এক কথা। শুধু শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম বলাই এই পুস্তক লেখার উদ্দেশ্য নহে; ইহার উদ্দেশ্য (শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক) সর্ব্বপ্রকার স্বাস্থ্য-রক্ষার উপায় নির্দ্দেশ করা।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে যে, যাঁহার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ, যাঁহার রক্ত খারাপ হয় নাই, যাঁহার আহার সাত্বিক, সাপের বিষ তাঁহার শরীরে দংশনমাত্র ক্রিয়া করিতে পারে না; পক্ষান্তরে মদ্যপান ও মসলাযুক্ত অস্বাস্থ্যকর খাদ্য খাইয়া যাহার রক্ত গরম থাকে, তাহার শরীরে সাপের বিষ দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়। এই কথা বহু চিকিৎসকও নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। এক জন চিকিৎসক এ পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি লবণ ইত্যাদি ছাড়িয়া দিয়াছেন, আর কেবল ফলাহার করেন, তাঁহার রক্ত এত শুদ্ধ যে, তাঁহার শরীরে কোনো প্রকার বিষের ক্রিয়া হয় না। এ কথা কতদূর সত্য তাহা নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি না। যিনি মাত্র দুই এক বৎসর হইতে লবণ ইত্যাদি ছাড়িয়াছেন, তাঁহার রক্তে উপরে বর্ণিত গুণ থাকিতে পারে না। তাহার কারণ এই, বহু দিনের কু অভ্যাসের জন্য যে রক্ত দূষিত হইয়াছে, তাহা দুই এক বৎসরের ভিতর স্বাভাবিক শুদ্ধ অবস্থায় পৌঁছিতে পারে না।

পরীক্ষার দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি ভয়াতুর এবং ক্রোধী, কোনো স্বাভাবিক অবস্থার লোক অপেক্ষা তাহার ভিতর বিষের ক্রিয়া দ্রুত এবং বেশী হয়। সকলেই জানেন ক্রোধ এবং ভয়ের সময় নাড়ি ও হৃদপিণ্ডের গতি স্বাভাবিক অপেক্ষা দ্রুত হইতে থাকে এবং রক্ত জোরে চলিলেই তাহা গরম হইয়া উঠে। কিন্তু কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় যে গরম উৎপন্ন হয় তাহা স্বাস্থ্যকর নহে, বরং অত্যন্ত অনিষ্টকর। বাস্তবিক ক্রোধ একপ্রকার জ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারি, সর্পাদির বিষ হইতে রক্ষা পাইবার শ্রেষ্ঠ উপায় এই—পরিমিত সাত্বিক ভোজন করা, ক্রোধাদি হইতে মুক্ত থাকা, ভয়াতুর না হওয়া, সাপে কাটিলে "গেলাম গো! মলাম গো!" বলিয়া চীৎকার করিয়া চিকিৎসার পূর্ব্বেই মরিয়া না থাকা, পবিত্র জীবন যাপন দ্বারাই বিষ দূর হয় আর ভগবান যতদিন বাঁচিতে দিবেন ততদিন বাঁচিব—তার বেশী নহে, এ বিশ্বাস রাখা।

পোর্ট এলিজাবেথ যাদুঘরের প্রধান পরিচালক ডাঃ ফিট্‌জ্ সিম্যান জীবনের অধিকাংশ সময় সাপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেই ব্যয় করিয়াছেন। কত বিভিন্ন রকমের সাপ আছে, তাহাদের চালচলন কি ইত্যাদি বিষয়ে তিনি আলোচনা করিয়াছেন। সর্পদংশন ও তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহার কথা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বহু পরীক্ষার পর তিনি বলিয়াছেন, সাপে কাটার জন্য যাহারা মরে বলা হয়, তাহাদের বেশীর ভাগ লোক মরে ভয়ে এবং আনাড়ি চিকিৎসার জন্য;

মনে রাখিতে হইবে যে, সকল সাপ বিষধর নয়, এবং সকল প্রকার বিষধর সাপে কামড়াইলেও তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় না। আর এক কথা বিষের সম্পূর্ণ থলিটি মানুষের রক্তে ঢালিয়া দেওয়ার সুবিধা সকল

বিষধর সাপের সব সময় মিলে না। এই সব কথা বুঝিয়া, সাপে কাটিলে কাহারও ঘাবড়াইয়া যাওয়া ঠিক নহে। সাপে কামড়াইলে আজ কাল যে চিকিৎসা করা হয়, তাহা সর্পদষ্ট ব্যক্তি নিজেও করিতে পারে। সে প্রণালী এইরূপ ঃ—

শরীরের যেস্থানে সাপে কাটে তাহার উপরে শক্ত করিয়া রুমাল অথবা দড়ি বাঁধিবে। কোনো শক্ত পেন্সিল অথবা কাঠি তাহার ভিতর দিয়া ঘুরাইয়া আরও কষিয়া বাঁধিবে, যেন বিষ শিরার ভিতর দিয়া উপরে উঠিতে না পারে। তারপর ধারাল ছুরির সূক্ষ্ম মাথা দিয়া ক্ষতস্থান আধ ইঞ্চি পরিমাণ কাটিয়া বিষ-যুক্ত রক্ত বাহির করিয়া দিবে। পারমাঙ্গানেট অব পটাশ দিয়া ঐ স্থান ভরিয়া দিবে। এই গুঁড়া সাপে কাটার অমোঘ ঔষধ। একরূপ নল বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়—তার এক দিকে শক্ত ও ধারাল চাকু আছে আর এক দিকে এই গুঁড়া রাখা যায়। যদি এই ঔষধ না পাওয়া যায়, তবে রোগী নিজে অথবা অপর কোনো লোক যেন চুষিয়া ক্ষত স্থানের রক্ত বাহির করিয়া ফেলে। ইহাতে রক্তের সহিত বিষ বাহির হইবে। যাহার মুখে ঘা আছে অথবা যাহার দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়ে সে যেন কখনও রক্ত না চোষে। এই চিকিৎসা সাপে কাটার পাঁচ সাত মিনিট মধ্যে করিলে ইহাতে ফল পাওয়া যাইবে। যদি বিষ রক্তে মিশিয়া সারা শরীরে ছড়াইয়া পড়ে, তবে তাহা দূর করা খুব শক্ত।

মাটি চিকিৎসার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার জুষ্ট লিখিয়াছেন, "সাপে কাটার পর যে ব্যক্তি মরিয়া গিয়াছে মনে হইয়াছে, এমন লোককেও আমি মাটী-চিকিৎসা দ্বারা ভাল করিয়াছি। সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তার ভিতর রাখিয়া নূতন খোঁড়া মাটি দিয়া তাহার সমস্ত শরীর ঢাকিয়া দিয়াছি। ইহাতে মাটি শরীরে গরম উৎপন্ন করিয়া

বিষ চুষিয়া লইয়াছে এবং রোগী মাটি সরাইয়া দিয়া উঠিয়া বসিয়াছে।” জুষ্ট এই প্রকার আরও উদাহরণ দিয়াছেন। সর্পদংশন সম্বন্ধে যদিও আমার কোনো অভিজ্ঞতা নাই, তথাপি অন্যান্য অনেক স্থলে প্রয়োগ করার জন্য মাটি চিকিৎসার উপর আমার অচল শ্রদ্ধা আছে। পোটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট ক্ষতস্থানে লাগাইয়া এবং রক্ত চুষিয়া ফেলিয়া অতি শীঘ্র আধ ইঞ্চি পুরু আধ ইঞ্চি লম্বা চওড়া মাটির পুলটিস্ বাঁধিয়া দিবে। হাতে কামড়াইল সমস্ত হাত মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিবে। প্রত্যেকে মাটি পিষিয়া ছাঁকিয়া টিন ভর্ত্তি করিয়া যেন ঘরে এমন জায়গায় রাখিয়া দেন যাহাতে বৃষ্টির জল তাহাতে না পড়ে অথচ আলো ও হাওয়া লাগে। ছেঁড়া কাপড়ের পট্টীও তৈরী করিয়া রাখা দরকার। ইহা শুধু সাপে কাটার সময় কাজে লাগিবে না, অন্যান্য অনেক আকস্মিক বিপদে ইহা কাজ দিবে।

রোগী যদি অজ্ঞান হইয়া থাকে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়াছে মনে হয়, তবে জলমগ্ন ব্যক্তির শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য যে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা হয়, এক্ষেত্রেও তাহাই করিবে। গরম জল, লবঙ্গ এবং দারুচিনির ক্বাথ রোগীর জ্ঞান ফিরাইয়া আনার পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ। রোগীকে খোলা হাওয়ায় রাখিতে হইবে; কিন্তু তাহার শরীরের চারিদিকে গরম জলের বোতলের সেঁক দিবে অথবা ফ্লানেল গরম জলে ডুবাইয়া নিংড়াইয়া তাহা দিয়া শরীর মুছিয়া গরম করিবে।

বিছা প্রভৃতির কামড়

আমাদের মধ্যে একটা কথা আছে যে, ভগবান কাহাকেও যেন বিছার কামড়ের যন্ত্রণা না দেন। ইহাতে বুঝা যায় বিছার কামড়ের যন্ত্রণা খুব বেশী। সর্পদংশন অপেক্ষা বিছার কামড়ের জ্বালা অধিক তীব্র ও অসহ্য; তথাপি আমরা সাপকে বিছা অপেক্ষা বেশী ভয় করি, কারণ সাপে কাটিলে মৃত্যুভয় আছে কিন্তু বিছার কামড়ে প্রায়ই মৃত্যু হয় না। ডাক্তার মুর লিখিয়াছেন, যাহার রক্ত পরিষ্কার, বিছার কামড়ে সে খুব কম কষ্ট পায়।

বিছা অথবা এই প্রকার জীবের দংশনের চিকিৎসা খুব সহজ। যেখানে কামড়ায় সেখানে ধারাল চাকুর আগা দিয়া কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিবে। পরে ঐ স্থান চুষিয়া ফেলিবে। বিষ যাহাতে উপরে উঠিতে না পারে সে জন্য ঐ জায়গার উপর দিকে একটা বাঁধ দিবে এবং ক্ষত স্থানের উপর ছোট পট্টী বাঁধিয়া তাহার উপর মাটীর পুলটিস দিবে। ইহাতে বেদনা এক দম বন্ধ হইবে।

কোনো কোনো লেখক লিখিয়াছেন, ভিনিগার আর জল সমান ভাবে মিশাইয়া কাপড়ের পুরু পট্টী সেখানে বাঁধিয়া সব সময় ভিজাইয়া রাখিবে অথবা লবণ-জলে ক্ষত স্থানের চারিদিক ধুইতে থাকিবে। সম্ভব হইলে সেই স্থান লবণ-জলে ডুবাইয়া রাখিবে।

কিন্তু এই সব চিকিৎসার মধ্যে মাটির পুলটিসই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। দুর্ভাগ্যবশে কাহাকেও বিছায় কামড়াইলে সে যেন ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখে। পুলটিস্ যত পুরু হয় তত ভাল। এ জন্য দু'সের মাটিও যথেষ্ট নহে। কাহারও আঙুলে বিছায় কামড়াইলে তার কনুই পর্য্যন্ত পুলটিস্ দেওয়া দরকার, এ জন্য দুই সের মাটি বেশী হইবে না। একটী লম্বা পাত্রে জল দিয়া মাটি মাখিয়া তাহার ভিতর হাত ডুবাইয়া রাখিলে খুব শীঘ্র জ্বালা দূর হইবে।

চ্যালা (তেঁতুলে বিছা), বোলতা প্রভৃতি কামড়াইলেও এইরূপ চিকিৎসা করিবে।

—একাদশ অধ্যায়—

উপসংহার

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যাহা লেখার ইচ্ছা ছিল, তাহা শেষ হইয়াছে। পাঠকদের নিকট হইতে বিদায় লওয়ার পূর্ব্বে এই বই লেখার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আবার দুই একটী কথা বলিব।

আমি নিজের কাছে এই প্রশ্ন বার বার করিয়াছি, কেন এই বিষয়ে লিখিতে গেলাম? আমি চিকিৎসক নহি, আর এ সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট জ্ঞানও নাই। আমার পরামর্শ তো অপরিণত পর্য্যবেক্ষণ এবং অসম্পূর্ণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না? বাস্তবিক পর্য্যবেক্ষণ ও জ্ঞান উভয়ই অসম্পূর্ণ এবং ইহাদের পূর্ণতা হইতেই পারে না। কারণ নিত্য নূতন বিষয় চোখে পড়ে এবং নূতন চিন্তা মনে আসে। তবে কেন এ বই লিখিতে গেলাম?

ইহার উত্তরে বলা যায়, অসম্পূর্ণ প্রয়োগই চিকিৎসা-শাস্ত্রের আধার। ইহার অধিকাংশই 'গোলে হরিবোল' গোছের। আমার পুস্তক সেইরূপ ভাবিলেও ক্ষতি নাই। ইহার উদ্দেশ্য সৎ। রোগ হইলে তাহার প্রতিকার করা অপেক্ষা রোগ যাহাতে আদৌ হইতে না পারে তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। একটু চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে, রোগ নিবারণ করা সহজ। ইহা জানার জন্য বিশেষ জ্ঞানের দরকার নাই; তবে এ পথে চলা কঠিন। কয়েকটী ব্যাধি সম্বন্ধে লেখা এ জন্য উচিত মনে করিয়াছি যে, লোকে যেন বুঝে যে, সব ব্যাধির মূল কারণ অনেকাংশে এক বলিয়া তাহাদের

চিকিৎসা প্রণালীও এক হওয়া দরকার। কখনও কখনও দেখা যায় যে, খুব সাবধানে থাকিলেও এই পুস্তকে বর্ণিত রোগ কাহারও কাহারও হয়। তাহা দূর করার উপায় প্রায় সকলেই জানেন। আমার অভিজ্ঞতার কথা জানিলে তাহাদের সেই জ্ঞান একটু বৃদ্ধি হইতে পারে—ইহাতে কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

এখনও আসল প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা বাকী আছে। স্বাস্থ্যের প্রয়োজন কি? আমাদের ব্যবহার দেখিয়া তো মনে হয় যে, আমরা স্বাস্থ্যের কোন প্রয়োজনীয়তা বুঝি না। ইহা অতি সত্য কথা যে, শরীর হৃষ্টপুষ্ট রাখিয়া ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করা, শরীরকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জিনিষ মনে করা, এবং শরীর দৃঢ় থাকিলে তাহা লইয়া গর্ব্ব করাই যদি স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তবে এরূপ স্বাস্থ্য অপেক্ষা শরীরে দূষিত পিত্তাদি থাকাই ভাল।

সকল ধর্ম্মেই শরীরকে ভগবানের মন্দির বলা হয়। এই মন্দির আমরা ভাড়া পাইয়াছি। ভগবানের স্তুতি এবং পূজা রূপেই এই ভাড়া চুকান হয়। ভাড়াটিয়ার আর এক কর্ত্তব্য এই যে, তিনি ঘরখানির অপব্যবহার করিবেন না, ভিতরে বাহিরে তাহা সাফ রাখিবেন এবং নিরূপিত সময়ে মালিকের নিকট উহা যে অবস্থায় পাইয়াছিলেন সেই অবস্থায় ফিরাইয়া দিবেন। ভাড়াটিয়া যদি ভাড়ার সব সর্ত্ত পালন করেন তবে গৃহস্বামী সময় পূর্ণ হইলে তাঁহাকে পুরস্কার দিবেন এবং অমরত্বের উত্তরাধিকারী করিবেন।

জীবমাত্রের শরীর আছে। সকলেরই দেখা, শোনা, শোঁকা এবং বিষয়ভোগের জন্য একই রকম ইন্দ্রিয় আছে। এই সব বিষয়ে মিল থাকিলেও মানুষের শরীরকে চিন্তামণি বলা হয়। চিন্তামণির অর্থ এই যে, ইহার সাহায্যে আমরা যাহা চাই তাহাই পাইতে পারি

পশু-শরীর দ্বারা জীব জ্ঞানপূর্ব্বক ভগবানের ভক্তি করিতে পারে না। ইহাও নিঃসন্দেহ, যেখানে জ্ঞানমূলক ভক্তি নাই, সেখানে মুক্তি নাই, আর যেখানে মুক্তি নাই সেখানে সাচ্চা সুখও মিলে না এবং দুঃখের নাশও হইতে পারে না। শরীরকে যখন ভগবানের মন্দির বা ঘর মনে করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করা যায় তখন উহা কাজে লাগে; অন্যথা উহা হাড়, মাংস, রক্ত ইত্যাদি পূর্ণ একটি দুর্গন্ধ পাত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহার ভিতর হইতে যে জল ও শ্বাস বাহিরে নির্গত হয় তাহা বিষাক্ত জিনিষ। শরীরের অসংখ্য ছোট বড় ছিদ্রপথে সে সব জিনিষ বাহিরে আসে তাহাদের একত্র করিয়া রাখার ইচ্ছা আমাদের হয় না। তাহাদের চিন্তা করিলে, দেখিলে এবং ছুঁইলে আমরা বমি করি। খুব পরিশ্রম করিলেও কোনো মতে শরীর হইতে নির্গত ঐ জিনিষের ভিতর কি পোকা পড়া আমরা ঠেকাইতে পারি? ঐ জিনিষ কি অবিকৃত রাখিতে পারি? এইরূপ শরীরের জন্য বেইমানী, দাগাবাজী, স্বেচ্ছাচারিতা, কপটতা, চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি লক্ষ লক্ষ অকরণীয় কাজ করা কত লজ্জার বিষয়! যে দেহ সব রকম চেষ্টা সত্ত্বে সামান্য আঘাতে নষ্ট হইয়া যায়, আমরা কি এই সব কাজ করার জন্য সেই শরীরের প্রত্যহ যত্ন করি?

ইহাই শরীরের প্রকৃত অবস্থা। যাহা খুব উপকারী তাহার ভিতরও অনিষ্ট করার শক্তি নিহিত আছে। নতুবা আমরা তাহার প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারিতাম না। সূর্য্যালোকের মূল্য আমরা এজন্য নিরূপণ করিতে পারি যে, তাহার অভাবে আমরা অন্ধকার দেখি; শুধু ইহাই নহে, যে সূর্য্য বিনা আমরা এক ঘণ্টাও বাঁচিয়া থাকিতে পারি না, সেই সূর্য্যের আমাদের সকলকে ভস্মসাৎ করার শক্তি আছে। সেইরূপ রাজাও প্রজার মঙ্গলও করিতে পারেন আর

অনিষ্টও করিতে পারেন। বাস্তবিক শরীর যতক্ষণ ভৃত্যের কাজ করে ততক্ষণ ইহা দ্বারা অনেক কাজ হয়, কিন্তু যখন ইহা প্রভু হয় তখন ইহার অনিষ্ট করার শক্তি অসীম হইয়া উঠে।

শরীরকে দেখলে আনার জন্য ভগবান এবং শয়তানের ভিতর অনবরত লড়াই চলিতেছে। শরীর যখন ঈশ্বরের অধীন থাকে তখন ইহা রত্নসদৃশ; যখন শয়তানের অধীন থাকে তখন সাক্ষাৎ নরকতুল্য। যে শরীর বিষয়াসক্ত, যাহার ভিতর সারাদিন সব রকম পচা জিনিষ (খাদ্য) ভরা হয়—যে জিনিষ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়—যাহার হাত পা চুরি প্রভৃতি অযোগ্য কাজ করে, যাহার জিহ্বা অখাদ্য খায় ও অকথ্য কথা বলে, যাহার চোখ অদর্শনীয় জিনিষ দেখে, যাহার কাণ অশ্রাব্য কথা শুনে, যাহার নাক ঘ্রাণের অযোগ্য বস্তু শোঁকে, সেই শরীর তো নরকভোগই করিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নরককে সকলেই নরকরূপেই দেখে, কেহ তাহাকে স্বর্গ মনে করে না, কিন্তু যে শরীরকে আমরা নরকের অপেক্ষা নিকৃষ্ট অবস্থায় পাতিত করি তাহাকে আমরা স্বর্গ-স্বরূপ মনে করি। শরীর সম্বন্ধে এই নারকীয় দম্ভ ও রাক্ষসী ভণ্ডামী অনেকদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। পায়খানাকে আমরা পায়খানা মনে করিয়াই ব্যবহার করিব, এবং প্রাসাদকে প্রাসাদের মত ব্যবহার করিব। যে ইহার উল্টা ব্যবহার করে সে বিপরীত ফল পাইবে। ঠিক এই কথা শরীর সম্বন্ধেও খাটে। যাহার শরীর আত্মার অধীন না থাকিয়া শয়তানের অধীন থাকে, সে যেন স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তে ধ্বংসই কামনা করে—কারণ বাস্তবিক সে ধ্বংসই হইবে।

স্বাস্থ্যনীতি আলোচনা দ্বারা আমরা ইহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ঈশ্বরীয় নিময় পালন দ্বারাই শরীর সুস্থ থাকিতে পারে—শয়তানী নিয়ম পালন করিলে থাকিতে পারে না। যেখানে প্রকৃত স্বাস্থ্য

সেইখানেই প্রকৃত সুখ। প্রকৃত স্বাস্থ্যলাভ করিতে হইলে আমাদের স্বাদেন্দ্রিয় জিহ্বাকে সংযত করিতে হইবে। জিহ্বা সংযত হইলে অন্যান্য ইন্দ্রিয় আপনা হইতে সংযত হইবে। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-জয় করিয়াছেন, তিনি সমগ্র জগৎ জয় করিয়াছেন, কারণ তিনি ঐশ্বরিক গুণসম্পন্ন ও তাঁহার অংশরূপে পরিণত হন। রামায়ণ পড়িয়া রামকে, গীতা পড়িয়া কৃষ্ণকে, কোরাণ পড়িয়া খোদাকে এবং বাইবেল পড়িয়া যীশুখৃষ্টকে পাওয়া যায় না। চরিত্রবলেই ভগবানকে পাওয়া যায়। চরিত্রের ভিত্তি নীতি-আচরণে আর নীতির ভিত্তি সত্যে। সত্যই শিব অথবা মঙ্গল অথবা সমস্ত মহান জিনিষের মূল। স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গেও পাঠকদের মধ্যে এই ভাব অল্পবিস্তর জাগাইতে পারিলেই এই পুস্তক লেখা সার্থক হইয়াছে মনে করিব।

বিনয়কৃষ্ণ সেন সঙ্কলিত ও প্রণীত গ্রন্থাবলী

মহাত্মা গান্ধী লিখিত

স্বাস্থ্যনীতি ।|০

ঔষধ ব্যবহার না করিয়া কিরূপে লোকে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকিতে পারে মহাত্মাজী অনেক দিন ধরিয়া তাহা নিজে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা চিকিৎসকের শরণাপন্ন না হইয়া রোগমুক্ত হইতে এবং স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে চান তাঁহারা এই গ্রন্থখানি পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন। স্বাস্থ্যরক্ষার মূলতত্ত্ব ভিন্ন ইহাতে জ্বর, অজীর্ণতা, বসন্ত কলেরা প্রভৃতি এবং জলে ডোবা, আগুনে পোড়া, সাপে কামড়ান ইত্যাদি আকস্মিক বিপদের চিকিৎসা প্রণালী আলোচিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন গর্ভসঞ্চার কাল হইতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত প্রসূতির কর্ত্তব্য শিশুপালন প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থের বিশেষত্ব।

ব্রহ্মচর্য্য ।|০

সঞ্জীবনী—মহাত্মা গান্ধী নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে যে সকল সত্য লাভ করিয়াছেন এই পুস্তকে তাহা স্পষ্ট ও সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে। আমরা বাংলার যুবকগণকে এই পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি। দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রবাসী—ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে বাংলায় দুষ্পাচ্য বই অনেক আছে; কিন্তু সত্যকার শীলতা ও শোভনতা এ প্রবন্ধ কয়টিতে যেমন স্পষ্ট, তেমন কোথাও দেখা যায় না। অনুবাদের মধ্যেও বিনয়বাবু মহাত্মাজীর সরল সতেজ ও সংযত ভাবটিকে ঠিকরূপে ধরিয়াছেন।

দুর্নীতির পথে ।৵০

জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া গান্ধীজী যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যাঁহারা ভাবেন তাঁহারা ইহাতে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক পাইবেন। পুস্তকের পরিশিষ্টে পাশ্চাত্যের কয়েকজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের মূল্যবান প্রবন্ধের অনুবাদ আছে। অন্য দেশের সহিত তুলনা করিয়া ভারতবর্ষে জন্মনিয়ন্ত্রণের কি বিধি অবলম্বন করা উচিত মহাত্মাজী তাহার বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।

নীতি-ধর্ম্ম ।০

বর্ত্তমানে প্রায় সকলে প্রকৃত ধর্ম্ম ভুলিয়া ধর্ম্মের খোলস লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে। সনাতন নীতি-ধর্ম্ম কি, মানুষ নীতিমান হইয়া চরিত্র উন্নত করিয়া কিরূপে জীবন মধুময় করিতে পারে, তাহার ইঙ্গিত ইহাতে আছে। সকল ধর্ম্মের ও সকল দেশের লোকের পক্ষে উপযোগী।

সাধনার পথে ।৶০

মহাত্মা গান্ধী-লিখিত গুজরাতী 'ব্রত বিচার'এর অনুবাদ। ইহাতে সত্য, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, অস্বাদ, অস্তেয়, অপরিগ্রহ, অভয়, অস্পৃশ্যতা নিবারণ, স্বদেশী প্রভৃতি কতকগুলি ব্রতের আবশ্যকতা সম্বন্ধে গান্ধীজীর আধুনিক ব্যাখ্যা আছে।

গীতাভাষ্য অনাসক্তিযোগ ।৵০

হিন্দুধর্ম্মে যাহাকে অদ্বিতীয় গ্রন্থ বলা হয় সেই গীতার নাম মহাত্মা গান্ধী কেন অনাসক্তিযোগ দিলেন এবং গীতার শিক্ষাকে পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করার জন্য চল্লিশ বৎসর ধরিয়া সর্ব্বদা চেষ্টা করার পর গীতার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে মহাত্মাজীর যে ধারণা হইয়াছে তাহা ইহাতে আছে। মূল গুজরাতীতে গান্ধীজী গীতার যে অনুবাদ ও ভাষ্য করিয়াছেন তাহার সুন্দর বাংলা অনুবাদ। গীতাকে ঠিকভাবে বুঝিতে হইলে ইহা প্রত্যেকের পাঠ করা উচিত। অবাঁধা চার আনা।

অস্পৃশ্যের মুক্তি ৵০

প্রবর্ত্তক—অস্পৃশ্যের মুক্তি যুগদেবতার বাণী—তাঁর বজ্রকঠিন আদেশ-মন্ত্র। এই আদেশ শোনাতে গিয়েই লোকগুরু মহাত্মা বলেছেন—"হিন্দু-মুসলমানের একতার অভাবে হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট হবে না। খদ্দর চরকা না চল্‌লেও হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট হবে না। কিন্তু অস্পৃশ্যতা দূর না হলে হিন্দুধর্ম্ম ধ্বংস হবে।"

প্রবাসী—এই পুস্তক প্রকাশ করিয়া বিনয়বাবু বাংলাদেশের উপকার করিয়াছেন। আপামর বাঙ্গালী হিন্দু পুস্তকখানি পাঠ করুন।

বিধবা বিবাহ ৵১০

প্রবাসী—বিধবাদের দুঃখমোচনের জন্য যাঁহারা চিন্তা করিতেছেন, এই সারবান যুক্তিপূর্ণ পুস্তক তাঁহাদের পাঠ করা কর্ত্তব্য। পঞ্চম সংস্করণ।

বাংলার কথা—বিনয়বাবু হিন্দুসমাজের প্রকৃত হিতসাধন করিয়াছেন।

বিনয়কৃষ্ণ সেন প্রণীত

স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীনতা ১৲

ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের ভিতর অধুনা যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব বর্ত্তমান আছে, চিরদিন তাহা ছিল না। এককালে এ দুটি জাতি পরস্পরের শত্রুতাসাধনে তৎপর ছিল। ইংলণ্ডরাজ প্রথম ও দ্বিতীয় এডোয়ার্ডের শত চেষ্টা ও কৌশল ব্যর্থ করিয়া স্কচ জাতি কিরূপে রক্ত-সাগরে স্নান করিয়া স্বাধীন হইয়াছিল তাহার চিত্তাকর্ষক ও চমকপ্রদ কাহিনী।

সুইজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা ৸৹

মনোজ্ঞ গল্পে সুইস স্বাধীনতার কথা। উপন্যাস অপেক্ষাও মনোরম।

প্রবাসী—ভাষা বেশ সরল। দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের যুগে এই জাতীয় পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয় সংস্করণ।

আনন্দবাজার পত্রিকা—সুইজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতার চিত্তাকর্ষক ইতিহাস জাতীয় মুক্তি-কামনায় উদ্বুদ্ধ প্রত্যেক ভারতবাসীর পাঠ করা কর্ত্তব্য। স্কুলের বালক-বালিকাদের তরুণচিত্তে দেশপ্রেমের চেতনা জাগাইতে ও উচ্চতর ভাবধারা সঞ্চার করিতে এই সরস চিত্তাকর্ষক ও মহত্বপূর্ণ পুস্তকটি যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

বাংলার কথা—ভাষা সহজ সরল, বর্ণনাভঙ্গিও বেশ। পাঠে লাঞ্ছিত উৎপীড়িত জাতির দুঃখে স্বভাবতই সহানুভূতি জাগিবে ও স্বাধীনতার স্পৃহা প্রবল হইয়া উঠিবে।

প্রবর্ত্তক—লেখা প্রাঞ্জল ও মর্ম্মস্পর্শী। বালক যুবক সকলেরই অনুপ্রেরণার বস্তু—জানা ও পড়া উচিত।

বিপ্লবের আহুতি ১৲

বিপ্লবীদের উপর রুশ গভর্ণমেণ্টের ভীষণ অত্যাচারের করুণ কাহিনী। রুশ-আমলাতন্ত্রের অন্ধ অবিচারে দেশহিতব্রত সর্ব্বত্যাগী যুবকগণের দেহপ্রাণ কিরূপে নিপীড়িত হইয়াছে, নির্জ্জন কারাগারের অন্ধকারের চাপে মানুষের মন কিভাবে ধীরে ধীরে অপ্রকৃতিস্থ হইয়া যায়, সরু ছড়ির পুনঃ পুনঃ আঘাতে কেমন করিয়া মানুষের প্রাণ 'আইন-সঙ্গত' উপায়ে বাহির করা হইত তাহা অপূর্ব্ব নিপুণতার সহিত প্রত্যক্ষবৎ দেখান হইয়াছে।

প্রবাসী—আমাদের দেশাত্মবোধক গ্রন্থমালায় বইখানি বিশেষ স্থান অধিকার করিবে।

স্বাধীনতার সংকল্প ।৹

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী সমগ্র ভারত স্বাধীনতার যে সঙ্কল্প গ্রহণ করে তাহার প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ। বড়লাটের নিকট মহাত্মা গান্ধী লিখিত বিখ্যাত চিঠির অনুবাদ এবং ভারতের ভয়াবহ দারিদ্র্য বৃদ্ধির কারণ আলোচনা প্রভৃতি ইহাতে আছে।

হিন্দুসংগঠন ১৲

সংখ্যায় বহু, ধন-সম্পদ-বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইয়াও হিন্দু কেন বিদেশীর চরণে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়াছিল, কি কি সামাজিক গলদের জন্য সে এখনও জগতসভায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না তাহার নিখুঁত চিত্র।

প্রবাসী—আলোচ্য পুস্তকখানিতে বিনয়বাবু যথেষ্ট চিন্তাশীলতা, গবেষণা ও দেশাত্মবোধের পরিচয় দিয়াছেন।

বিপ্লবী হিন্দু ৸৹

সামাজিক অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া বিরাট হিন্দু-সমাজে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে ইহা তাহারই চিত্র। 'পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা' যুগ কিরূপে শেষ হইতে চলিল তাহার বিবরণ পাঠে অত্যাচারীর বুক দুরু দুরু কাঁপিবে, নির্য্যাতিতের প্রাণে আশার সঞ্চার হইবে। গুরু-পুরোহিতের অত্যাচার, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা-বিষে জর্জ্জরিত সমাজ রক্ষার উপায় ইহাতে নির্দ্দেশিত আছে। তরুণের এই বিদ্রোহের সহিত দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধ যে কত ঘনিষ্ঠ তাহাও সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ।৹

সরল বাংলায় বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ও তাহার ব্যাখ্যা। হিন্দু-মুসলমান নেতাদের মতামত সম্বলিত ও বহু প্রয়োজনীয় তথ্যপূর্ণ